সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি

ডঃ মনীন্দ্র নাথ জানা

সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি

ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানা
এম. এ. (ট্রিপল) বি. টি., পি. এইচ. ডি.

দীপালী বুক হাউস
১২/১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

Sundarbaner Samaj
O Sanskriti
By
Dr. M. N. Jana

Rupees 12·00

প্রকাশক ঃ
দীপালী বুক হাউস
১২/১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ—১৯৪৪ জানুয়াবী

মূল্য—১২ টাকা

মুদ্রণ ঃ
সনাতন হাজবা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬

॥ নিবেদন ॥

পূর্বে 'সুন্দরবন বিচিন্তা' নামে সুন্দরবনের কিছু তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলাম। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রাকার হলেও একটি মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ হিসাবে বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাদর লাভ করেছিল। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই গবেষণা কার্য আরও ব্যাপক ভাবে চালাবার জন্য বিপুল উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীসুকুমার দাস, আই. এ. এস. মহাশয়ের নাম এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু পত্র-পত্রিকায় এই গ্রন্থটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। গ্রন্থটির কিয়দংশসহ নবলব্ধ বহু তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে 'সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা করি। কিন্তু সময়-সুযোগ ও অর্থাভাবে তা এতদিন সম্ভব হয়নি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অর্থানুকুল্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এর জন্য সদাশয় সরকারের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভারত-ভূমির সর্ব দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দবরন এক অতি বিচিত্র বনভূমি। সুন্দরবনবাসীর জীবন আরও বিচিত্র। কারণ এই বিশাল বনভূমির 'ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর।' এই ভয়ঙ্কর নরখাদক হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে দিবারাত্রি লড়াই করে জীবন যাপন করতে হয় সুন্দরবনের অগণিত মানুষকে। সুন্দরবনের লোনা মাটিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংগ্রহ করতে হয় এদেব পেটের অন্ন। সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় নরখাদক বিশালকায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের রাজ্যে হানা দিয়ে প্রাণের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হয় মধু আর কাঠ! সুন্দরবনের সরীসৃপ ও নরখাদক কুমীর-সংকুল নদী ও ঝরায় ধরতে হয় মাছ। কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ আর মাছ ধরাই ছিল আদি সুন্দরবনবাসীর মূল জীবিকা। লবণাক্ত জল ময় বনভূমি তখন ছিল কৃষির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, ঘন জঙ্গল সাফাই করে সুন্দরবনকে শস্যশ্যামল করে তুলতে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে বহু অমূল্য জীবন। এর ইতিহাস সত্যই অতি বিস্ময়কর। কালক্রমে

ধীবে ধীরে গড়ে উঠেছে শ্বাপদসংকুল বনভূমিতে এক বৃহৎ জনপদ ও তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতি অর্থে ডঃ নীহার রঞ্জন বায়ের মতে আমবা বলতে চাই অবণ্যভূমিতে 'খাদ্যোৎপাদন ও সন্তান প্রজনন থেকে শুরু কবে সঙ্গীত ও নৃত্য, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং সংসাব বাসনাহীন অধ্যায় সাধনা পর্যন্ত' সুন্দববনেব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীমানুষ নিজেদের জীবনেব উন্নতি ও সংস্কাবেব জন্য যে যে কর্মে লিপ্ত হয়েছিল সে সব কর্মেব ফলশ্রুতিই সুন্দব নেব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। জীবনেব সমস্ত আবর্জনা ও মালিন্য দূব কবে সর্ববিধ উপায়ে সুন্দব-বনবাসীবা নিজেদেব উন্নতি সাধনেব কর্মেব মধ্যেই সুন্দববনেব স স্কৃতি অন্তর্নিহিত। এই সংস্কৃতি দেশ কাল ও ধর্মানুযায়ী প্রকৃতিব নিয়ম মেনে নিবলসভাবে প্রবাহিত হয়ে চ.লছে। সুন্দ‹ব'নব সমাজ গ.ড উঠেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনে। স্থাপিত হয়েছে এক বিশেষ সমাজ – মেহনতী মানুষে‹ সমাজ। সুতবাং সু‹‹বব নব সমাজ ও স‚স্কৃতি বলতে আমবা বুঝি সুন্দববনেব মেহনতী সর্বহাবা মানুষেব সমাজ ও স‚স্কৃতি। ধাবাবাহিকভা ব সেই কথা সক'লব সামনে তুলে ধবাব চেষ্টা কবেছি এই পুস্তকে। সুদব প্রাচীন কা‹ ‹ স স্কৃতিব বহু চিহ্ন বিক্ষিপ্ত‹াবে ছড়িয়ে আছে সমগ্র সুন্দববনে‹ বহুস্থা ন গহন অবণ্যেব মধ্যেও বয়েছে পাল ও সেন যুগে‹ পুবাকীর্তি, বহু ভগ্ন প্রাসাদ ও দুর্গ বহু মূল্যবান তথ্য এখনও মানু'ষ‹ অজ্ঞাত আমা‹ পক্ষে যতদূব সম্ভব ততদূব যাবাব চেষ্টা কবেছি। এই গ্রন্থ বচনা ও প্রকাশেব জন্য যাদেব সক্রিয় সাহায্য পেয়েছি তাদে সকলকে জানাই আমাব গভীব শ্রদ্ধা ও প্রীতি। ডঃ দুলাল চে ধুবী, ডঃ বরুণ চ‹‹বর্তী, তুহিন কান্তি বায়েব সর্ব প্রকাব সাহায্য ও উৎসাহ সর্বদা স্মবণীয়। আমাব প্রথমা কন্যা মাধুবী ও জামাতা শ্রীশশাঙ্ক, নিকট-আত্মীয় শ্রীমান ‹ জিত, দ্বিতীযা কন্যা শাশ্বতী পত্নী বীনাপানি এই পুস্তক বচনায় প্রভূত সাহায্য কবেছে। প‹মেশ্ববেব নিকট তাদে‹ কল্যাণ কামনা কবি। সুন্দবব.নব সমাজ ও স স্কৃতিকে জানতে এই পুস্তক কিছু সাহায্য কবলে আমাব শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত—লেখক

ভূমিকা

ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানা ইতিমধ্যেই একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ্ হিসাবে স্বীকৃত, কিন্তু ডঃ জানা নিজেকে নিছক শিক্ষাদানের কার্যেই নিযুক্ত না রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগণা অঞ্চলের নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে নিষ্ঠাবান সমাজসেবী-রূপেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মপ্রচেষ্টার আর একটি নিদর্শন হ'ল সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটি। ইতিপূর্বে ডঃ জানা সুন্দরবনকে নিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। বলা চলে বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর সেই পূর্বের পুস্তিকার পরিণত রূপ। কর্মসূত্রে যিনি সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দা সেই অঞ্চলের সঙ্গে যে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক বহুকাল পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে, তারই একটি প্রামান্য নিদর্শন বর্তমান গ্রন্থটি। ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ তথ্যাবলী-নির্ভর বর্তমান গ্রন্থটি সকল প্রকার ভাবালুতা মুক্ত, যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত রচনা হওয়ায় সুন্দরবন অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবং গবেষক গ্রন্থটি থেকে মূল্যবান রসদ লাভ করবেন।

গ্রন্থটি থেকে পাঠক সুন্দরবন অঞ্চলের সামগ্রিক পরিচয় সীমিত পরিসরে অথচ প্রামাণ্যভাবে লাভ করতে সমর্থ হবেন, তাই সেদিক দিয়ে গ্রন্থটির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রবীন লেখক সুন্দরবন অঞ্চলের নামকরণ থেকে শুরু করে এখানকার ভৌগোলিক সংস্থান, নানা সূত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের এখানে বসতি স্থাপন, তাদের জীবিকার বৈচিত্র্য, এখানকার আঞ্চলিক সাহিত্য এবং অনুসৃত ধর্ম বিশ্বাস, লোকাচার এবং লৌকিক দেবদেবীদের স্বরূপ ইত্যাদি নিয়ে যুক্তি-নিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের এবং রচনার গুণে গ্রন্থটি যে পাঠক মহলে সমাদৃত হবে সে ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত। এমন একটি গ্রন্থ রচনার জন্য লেখক সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী
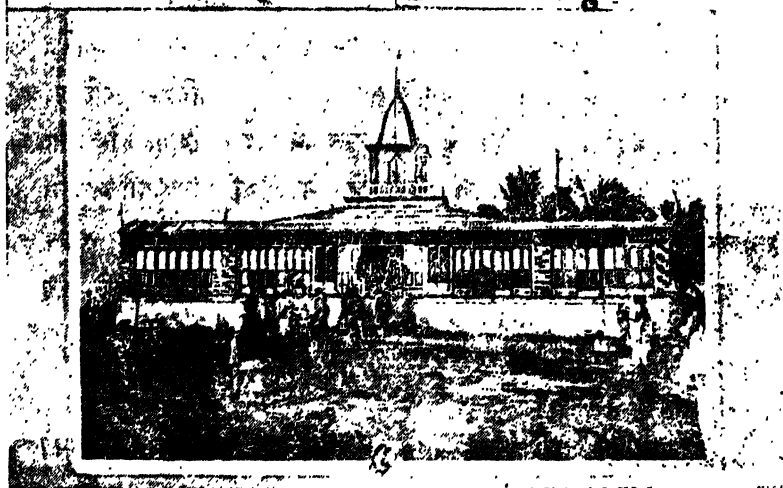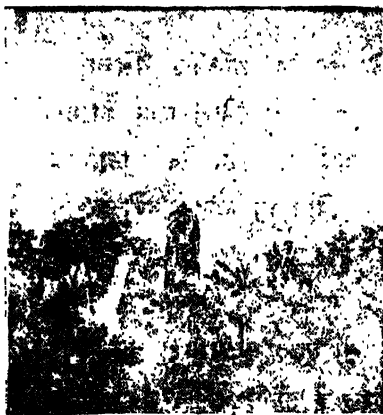
মুখবন্ধ

ডঃ মণীন্দ্রনাথ জানা প্রণীত 'সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থখান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানের অর্থে প্রকাশিত হলো. এ যথার্থই আনন্দের বিষয়। প্রাচীন সমতট পরবর্তী কালের বিশাল অরণ্য ভূমি সুন্দরবন প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি ছোটবড়ো দ্বীপ-নিয়ে গঠিত। প্রাচীনকালের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বংশ ধারায় নামাঙ্কিত চন্দ্রবন কী করে চন্দরবন এবং শেষপর্যন্ত তা কীভাবে সুন্দরবন হয়ে গেলো তা' যেমন কৌতূহল-উদ্দীপক একটি জ্ঞাতব্য বিষয়, তেমনি এমন অনেক অজ্ঞাত বিষয় রয়েছে সুন্দরবন সম্পর্কে যে সব তথ্য বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে বর্তমান গ্রন্থকার বাঙালী পাঠকদের জানবার সুযোগ করে দিয়েছেন। দেশ বিভাগ তথা বঙ্গ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবনকেও বিভক্ত হতে হয়েছে। এর বৃহত্তর অংশ প্রথমে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থাৎ বর্তমানে বাঙলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এবং বাকী অংশ অঙ্গীভূত হয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে।

একদার জনমানবহীন ভূ-খণ্ড সুন্দরবনে ধীরে ধীরে কিভাবে জনসমাজ গড়ে উঠেছে এবং দেশবিভাগ তথা স্বাধীনতা লাভের পর কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের অংশ সুন্দরবন পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা হিন্দুদের একটা বড়ো আশ্রয়স্থল হয়ে উঠলো, সুন্দর-বন জনসমাজের সেই আনুপূর্বিক বিবর্তনের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। শুধু বাঙালী কেন, দেশীয় ও বিদেশীয় গবেষকদের সবার পক্ষেই মহারণ্য বিষয়ক গবেষণায় সুপ্রাচীন-কাল থেকে বর্তমানকাল অবধি সুন্দরবনের বিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্তভাবেই অপরিহার্য। এই গ্রন্থখানি সেই দিক থেকে গবেষকদের কাছে যথার্থই সহায়ক বলে বিবেচিত হবে মনে হয়।

সুন্দরী বৃক্ষ সমৃদ্ধ এই সুবিশাল অরণ্যানীর অন্য যে তিনটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হলো, সুন্দরবনের বাঘ যাকে বলা হয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার, এখানকার দীর্ঘকায় মহাবলী কুমীরকুল এবং এ মহাবনের মৌচাকের খাঁটি মধু। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্থানীয় বাঘদের লক্ষ্য করেই কবিতায় লিখেছিলেন, 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি'। বাস্তবিকই দেশবিভাগের আগে হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই বাঘের রাজ্য সুন্দরবনে

কিছু কিছু নিঃস্ব-নিঃসম্বল আদিবাসী-উপজাতির মানুষ এসে এখানকার নদীতে মাছ ধরতে, বনের কাঠ কাটতে এবং মৌচাক থেকে মধু আহরণ করে ব্যবসা করতে থাকে। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে বাঘ-কুমীরের পেটে যেতে হতো। তবু মানুষ দমেনি। পলাশী যুদ্ধের পর দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ইংরেজের কৃপায় সুবে বাঙলার নবাব হয়েই ১৭৫৭ সালের ২৮ জুন ইংরেজদের ২৪ পরগণা জেলা দান করেন। ঐ জেলারই অন্তর্গত এবং চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বর্ণিত একদার ভারতীয় রাজ্য গঙ্গারিডি (গঙ্গাহৃদি)-র একাংশ সুন্দরবনে নতুন করে লোক সমাগম শুরু হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে চলে। বঙ্গোপসাগরের লোনা জলবেষ্টিত দ্বীপ সমষ্টি নিয়ে গঠিত এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সুন্দরবন নামকরণ হয়েছে বৃটিশ আমলের আরম্ভে স্থানীয় সুন্দরী বৃক্ষের প্রাচুর্যের জন্যে, অনেকে এরূপও মনে করে থাকেন।

যাই হোক, ডক্টর মণীন্দ্রনাথ জানা প্রণীত 'সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার তদঞ্চলের সমাজ সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বিবিধ তথ্য প্রমাণসহ গ্রথিত করেছেন। বহু শাস্ত্রীয় শ্লোকের ও প্রতিভাধর লেখকদের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক তাঁর নানা বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুন্দরবন সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত বিষয় ডক্টর জানা যেভাবে তুলে ধরেছেন দেশবাসীর সামনে তা' বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। প্রুফের ভ্রম সংশোধনে আর একটু দৃষ্টি দিলে ভালো হতো। আমি গ্রন্থখানির যথাযোগ্য সাফল্য কামনা করি। ইতি,

দক্ষিণা রঞ্জন বসু
সম্পাদক, দৈনিক উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় :

সুন্দরবনের সমাজ বর্ত্তমান ও অতীত—

(১) নামের উৎস ... ১
(২) জীবন ও জীবিকা ... ৪
(৩) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র সমাজ ... ১৬
(৪) লোক সমাজ বা আরণ্যক সমাজ ... ১৯
(৫) পূর্ব্বপুরুষ ... ২৪
(৬) নানা জাতি নানা আচরণ ... ৩৮
(৭) মন্তব্য ... ৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায় :

(১) সুন্দরবনের সংস্কৃতি ... ৬২
(২) ভাষা ও সাহিত্য ... ৬৬

তৃতীয় অধ্যায় :

লৌকিক দেবদেবী—

(১) বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর উৎপত্তি ... ৭৫
(২) বনবিবি ... ৭৭
(৩) দক্ষিণা রায় ... ৯৫
(৪) লৌকিক কাব্য রায়মঙ্গলের দক্ষিণ রায় ... ৯৮
(৫) রায় বংশের ইতিবৃত্ত ... ১০৬
(৬) বড় গাজী খাঁ ... ১০৯
(৭) কতিপয় মূল্যবান বক্তব্য ... ১১৩

চতুর্থ অধ্যায় :

সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য

(১) জলপথ ... ১১৪

বিষয় | পৃষ্ঠা

(২) যন্ত্রচালিত জলযান ... ১১৬

(৩) স্থলপথ : রেল ও বাস ... ১১৮

(৪) শিল্প .. ১২১

(৫) মন্তব্য : .. ১২২

পঞ্চম অধ্যায় :

শিল্পকলা—

(১) অর্থ সংকেত : ... ১২৩

(২) সুন্দরবনের প্রাচীন মন্দির ... ১২৭

ষষ্ঠ অধ্যায় :

ধর্মকর্ম : ব্রত আচার

(১) ·· লৌকিক ধর্ম ... ১২৯

(২) বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম ... ১৩০

সপ্তম অধ্যায় :

সুন্দরবনের সংস্কৃতি কেন্দ্র ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় .. ১৩৩

অষ্টম অধ্যায় :

সাগরমেলা-সর্বভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন ... ১৪৬

প্রথম অধ্যায়

সুন্দরবনের সমাজ—বর্তমান ও অতীত

॥ ১ ॥

নামের উৎস

সুন্দরবন এক বিশাল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ, এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নামকরণ নিয়ে বহু মতভেদ আছে। এই ব-দ্বীপ খুবই প্রাচীন, কারণ বহু পুরাণ, বামায়ণ ও মহাভাবতে এই ব-দ্বীপেব উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এই সুবিশাল ব-দ্বীপ প্রকৃতপক্ষে বহু ছোট বড দ্বীপের সমষ্টি। এই দ্বীপমালার প্রাচীন নাম ছিল সমতট। অর্থেব দিক হইতে সমতট হইতেছে সেই ভূমি যে ভূমি সমুদ্রতটেব সমান, অর্থাৎ জোয়ারের জল যে পর্যন্ত প্রবেশ করে। ভাটি অর্থও প্রায় তাহাই।—"মধ্যযুগে মুসলমান ঐতিহাসিকেবা, তাবানাথ প্রভৃতি লেখকেবা ময়নামতী গানের রচযিতা প্রভৃতি ভাগীরথীব পূর্বতীব হইতে সুবা বাংলার পূর্বদিকে বেঙ্গলা পর্যন্ত, সমস্ত নিম্নাঞ্চলটাকেই বাটি বা ভাটি নামে অভিহিত কবিয়াছেন।" (বাংলাব নদনদী নীহার রঞ্জন রায়)। পববর্তীকালে তাই সুন্দববনকে বলা হত ভাটি অঞ্চল। কাবণ দক্ষিণবঙ্গেব সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বহু লবণ প্রস্তুতেব ভাটি ছিল, মলঙ্গী নামে এক শ্রেণীব লবণ প্রস্তুতকাবী ব্যক্তিগণ সৌব শক্তির সাহায্যে লবন প্রস্তুত কবতো এবং বাংলা ছাড়া তখন আর কোথাও লবণ তৈবী অজ্ঞাত ছিল। বাংলা ও বাঙালী লবণ উদ্ভাবন ও ব্যবহাবেব কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, ১১৭৬-এব মন্বন্তরে দুই তৃতীয়াংশ মলঙ্গী অনাবৃষ্টি ও বিষাক্ত লবনাক্ত জলের প্রকোপে কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর (১১৭১—১১৭৫) ধরে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু পানীয় ও খাদ্যাভাবে দক্ষিণবঙ্গে এই ভাটি অঞ্চল সম্পূর্ণ জনমানব শূন্য হয়ে

উঠে। এই জনহীন ভূখণ্ড সুন্দরী, গরান, গর্জন প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষলতা ও গুল্মাদির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে এক বিশাল জঙ্গলে পরিণত হয়। বঙ্গোপসাগরের জোয়ার ভাঁটায় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হতে থাকে। এর জন্যও অনেকে এই অঞ্চলকে ভাটির দেশ বলে। জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চল ক্রমে বাঘ, হরিণ, শূকর, সাপ ও কুমীরের নিরাপদ আশ্রয় স্থলে পরিণত হয়। এই গাঙ্গেয় সুবিশাল জঙ্গলে প্রচুর মাছ ও মাংস খেয়ে ব্যাঘ্রকুল আকৃতি ও দেহ সৌষ্ঠবে বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করে। এরা এত বিক্রমশালী হয়ে উঠে যে এই জঙ্গলে ব্যাঘ্রের সংখ্যা সর্বাধিক হয়ে যায়, এবং অন্যান্য জন্তুর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এই জঙ্গলের বিশালাকার স্বর্ণকান্তি কুমীরকুল। যা হোক, ব্যাঘ্রসংখ্যা-গরিষ্ঠ সমুদ্রতটের এই বিশাল বনভূমি ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল নামে অভিহিত হয়। পরবর্তীকালে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ কার্টিয়ারের শাসনকালে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতলগত। দিল্লীর সিংহাসনে বিলাসব্যসনে মত্ত ইংরেজদের কৃপা প্রার্থী বৃত্তিভোগী দ্বিতীয় শাহ্‌আলম্‌ আর বাংলার মসনদে তখন ইংরেজের পদলেহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের বংশধর নাজিম-উদ্দৌলা। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন মীরজাফর যখন ২৪ পরগনা ইংরেজদের দান করেছিলেন, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ তখন ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। অনেকের অনুমান ইংরেজরাই সর্বপ্রথম জনমানবহীন এই ব্যাঘ্রতটী অঞ্চলে পুনরায় জঙ্গল সাফাই করে জনবসতি স্থাপন করার প্রচেষ্টা করে। এবং সুন্দরী বৃক্ষ সমৃদ্ধ এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকে সুন্দরবন নামে অভিহিত করে এর সীমানা নির্ধারণ ও উন্নয়নের কাজে উদ্যোগী হয়। আবার অনেক বিশিষ্ট গবেষক মনে করেন, দক্ষিণবঙ্গের এই সুবিশাল জনপদের অধিকারী ছিল চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ, এই রাজবংশের নামানুসারে এই বনভূমির নাম হয়েছিল চন্দ্রবন পরে চন্দরবন বা সুন্দরবন হয়েছে।

অবশ্য ফরাসী প্রভাব এই নামকরণের উপর পড়েছিল বলেও অনেকে মনে করেন। কারণ ফরাসীরা এই চন্দ্রবনকে 'স্যাণ্ডারবন' বলতো, ইংরেজদের আমলে 'সুন্দরবন' রূপে উচ্চারিত হয়ে 'চন্দ্রবন'ই বর্ত্তমান সুন্দরবন রূপে পরিচিত হয়েছে। শেষোক্ত নামকরণ অনেকাংশে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতে সুন্দরবনের আর এক নাম 'গঙ্গারিডি'। কারণ গ্রীকদূত মেঘাস্থিনিসের বিবরণে গঙ্গারিডি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। টলেমিও তাঁর বিখ্যাত ভৌগোলিক গ্রন্থে ভাগীরথীর পূর্ব তীরস্থ গঙ্গারিডি রাজ্যের বর্ণনা করেছেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে যেমন গ্রীক দূত ভারত পরিভ্রমণ করে ভারতের বহু মূল্যবান বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিক সেইরূপ মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্ব কালেও চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ ভারতবর্ষের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে এই গঙ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ আছে। তৎকালে এই গঙ্গারিডি রাজ্য কজঙ্গল, পুণ্ড্র বর্ধন, কর্ণ-সুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়গণ এই তথ্য স্বীকার করেছেন। যথাক্রমে 'বাঙালীর ইতিহাস' ও 'বাংলার মঙ্গল কাব্য' গ্রন্থে।

যা হোক, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাসেল সাহেব সর্ব প্রথম সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে টিলমান হেনকেল্ সুন্দরবনের আয়তন ও সীমা নির্দ্ধারণে প্রয়াসী হন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র সুন্দরবনকে ১৫০ লটে বিভক্ত করে ৯৯ বছরের জন্য লীজ দেবার ব্যবস্থা হয়। মতান্তরে ১৯৩ লটে বিভক্ত করে লীজ দেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপটেন হজেস সুন্দরবনের যে মানচিত্র প্রণয়ন করে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন, তাহাই সুন্দরবনের প্রামান্য মানচিত্র বলে সর্বজন কর্তৃক গৃহীত। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে সুন্দরবনের সীমানা সঙ্কুচিত হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য মৎ প্রণীত

'সুন্দরবন বিচিন্তা' গ্রন্থে সীমা, আয়তন প্রভৃতি অংশগুলি দ্রষ্টব্য। সুন্দরবনের বর্তমান আয়তন ৯৬,২৬৯ বর্গ কিলোমিটার, এর মধ্যে ৪১,৬৩১ বর্গ কিঃ বনভূমি আর বাকি অংশ জনবসতি ও নদী নালায় পরিপূর্ণ। এর মধ্যে আছে, ১৫টি থানা ও ১৯টি উন্নয়ন সংস্থা। নব গঠিত সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের অন্তর্গত এইসব থানা ও ব্লক। থানাগুলির নাম সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথর প্রতিমা, কুলতলা, মথুরাপুর, জয়নগর, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, হাড়োয়া, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ ও মীনাখাঁ। প্রতি থানায় একটি ব্লক হিসাবে পনেরটি ব্লক এবং ক্যানিং, মথুরাপুর, জয়নগর ও সন্দেশখালি থানায় অতিরিক্ত একটি করে ব্লক থাকায় মোট ব্লকের সংখ্যা হয়েছে ১৯টি।

।। ২ ।।

জীবন ও জীবিকা

যা হোক্, ভারতবর্ষের সর্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবন এক অতি বিচিত্র বনভূমি। সুন্দরবন বাসীর জীবন আরও বিচিত্র। এই বিশাল বনভূমির "ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর"। নরখাদক শার্দুল ও হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে জীবন যাপন করছে সুন্দরবনের অগণিত অনুন্নত মানুষ। সুন্দরবনের আসল অধিবাসী কাঠুরিয়া জেলে ও ভূমিহীন বর্গাদার, এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে

সুন্দরবনের এক নূতন সমাজ। সুন্দরবনের অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকা গড়ে তুলেছে এই সমাজের ভিত্তি। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন স্থান থেকে যারা সহায় 'সম্বল হীন হয়ে এই দুর্গম স্থানে বসবাস করতে এসেছিল তারা কেউ মাছ ধরতো, আবার কেউ কাঠ কাটতো অথবা চাষের কাজে জনমজুরী করতো। এই সব কর্মের মাধ্যমে তারা তাদের জীবিকা অর্জন করতো এবং তাদের পরিবার প্রতিপালন করতো। সমীক্ষা করলে দেখা যাবে সমগ্র দক্ষিণ সুন্দরবনের অধি-বাসীরা বেশীর ভাগ এসেছে মেদিনীপুর জেলা থেকে.আবার কিছু কিছু লোক এসেছে হাওড়া জেলা থেকে। কিন্তু পূর্ব্ব সুন্দরবনের সংখ্যা-গরিষ্ঠ লোক এসেছে পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে, এরা এসেছে একেবারে উদ্বাস্তু হয়ে। আর দক্ষিণ সুন্দরবনে অর্থাৎ ডায়মণ্ড হারবার এবং আলিপুর মহকুমার দক্ষিণাংশে যারা বসতি স্থাপন করেছিল তারা উদ্বাস্তু হিসাবে আসেনি। তারা এসেছিল বিভিন্ন লটদার বা চকদারের লোক হিসাবে হয় জঙ্গল সাফাই কাজের জন্য বা চাষাবাদ করার জন্য। এরা কেউ কেউ এসেছে সপরিবারে এখানে কিছু জমি বিলি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষাবাদ করার অভিপ্রায়ে. এরা খুব অর্থবান ছিল না। নিজ পৈত্রিক জমিজমা বা বাস্তুভিটা দেনার দায়ে বিক্রি করে দিয়ে দেনা মিটিয়েছে এবং যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা নিয়ে বেশী জমি কম দামে পাবার আশায় জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে বাঘের রাজ্যে এসেছে। আর কিছু লোক লটদার বা চকদারের কর্মী হিসাবে একক ভাবে প্রথমে এসেছে। এখানকার সুযোগ সুবিধা দেখে পরে তাদের পরিবারের লোকজনদের নিয়ে এসেছে। এরা কিন্তু কোন জমি বিলি ব্যবস্থা নেয়নি। এরা লটদার বা চকদারের দেওয়া জায়গায় কোরফা হিসাবে ঘর বেঁধেছে এবং তাদের দেওয়া জমি ভাগে চাষবাস করেছে আর ফসল উঠলে জমির মালিকের দেনা পাওনা মিটিয়েছে। যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়েছে তা বাড়ি নিয়ে গেছে। নতুবা রিক্ত হস্তে ঝাঁটাকুলো নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। আবার বাএড

ধান হিসাবে ধান ও টাকা নিয়ে সংসার খরচ চালিয়েছে। এরূপ লোকের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধাংশ বা তার কিছু বেশী। জমিদারগণ নিজের স্বার্থে অনাবাদী জঙ্গলকে পরিষ্কার করে চাষাবাদ করার উপযোগী করার উদ্দেশ্যে এরূপ সহায় সম্বলহীন পরিবার গুলিকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে রাখত। কারণ তারা ভালভাবে বুঝত যে এদেব এখানে স্থায়ী করতে না পারলে তাদের জমির কোন উন্নতি হবে না। তাতে তাদের লাভের মোটা অংশের ক্ষতি হয়ে যাবে। তারা এদের এভাবে নিঃস্ব এবং জমিদারদের উপর নির্ভরশীল করে রাখত। আর একটী কারণে যে এরা যেন স্বাবলম্বী হয়ে অন্য স্থানে না চলে যেতে পারে। এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক এসেছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু শ্রেণী থেকে যেমন ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি, মেথব নমঃশূদ্র, বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় অর্থাৎ এখন যাদের মধ্যে অনেককে তপশীল শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে তারাই বেশীর ভাগ সুন্দরবন অঞ্চলে এসেছিল। কারণ বিত্তশালী জমিদার বা তাদের কর্মচারীগণ সভ্যজীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তখন এইসব স্থান যোগাযোগ শূন্য হাট বাজার হীন দুর্গম জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে কিছু দিন বাস করতে গেলে উপরোক্ত শ্রেণীর পেশার লোকের প্রয়োজন ছিল, তাই জমিদার বা চকদারগণ তাদেব কাছাডী বা জমিদারী বা চকদারী অফিস বা কার্য্যালয়ের পাশাপাশি এইসব শ্রেণীব লোকদের বিনামূল্যে পাঁচ কাঠা বা দশ কাঠা জমি দিয়ে বসিয়েছিল. তখন এখানে অর্থবল ছাড়া লোকবলের প্রয়োজন ছিল বেশী, লোকের মারফতই তখন সব কাজ করতে হতো। সুন্দর বনেব মধ্যে প্রবেশ করার কোন বাস বা রেল পথ ছিল না। একমাত্র নৌকাই ছিল যোগাযোগের উপায়। মেদিনীপুর, হাওড়া বা কলিকাতা থেকে নৌকাযোগে আসতে সময় লাগত ৭।৮ দিন, এব কিছু কম বা বেশী। অনুকূল হাওয়া হলে কম সময়ে যেত নতুবা প্রতিকূল হাওয়ায় দাঁড় টেনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দীর্ঘদিন লেগে যেত।

আর একশ্রেণীর লোক এখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করে-ছিল। তারা হলো জমিদার বা চকদারের বিভিন্ন কর্মচারী। এদের মধ্যে ছিল নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা ও লস্কর। নায়েব ছিল দ্বিতীয় জমিদার বা চকদার। দ্বিতীয় কেন এরাই ছিল আসল মালিক, জমিদারের লাভের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এরা উপভোগ করত। কারণ জমিদার বা চকদার বা তাদের ভোগবিলাসে মত্ত পুত্র প্রপৌত্রগণ এই দুর্গম স্থানে কদাচিৎ আসতো। যদি বা আসতো তারা বৎসরের মধ্যে ধান ঝাড়ানোর সময় একবার আসতো ধান বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার জন্য। আর কখনো ধারে কাছে ভিড়তো না। সুতরাং সুন্দরবনে ছিল নায়েব পিয়াদার রাজত্ব। নায়েব ছিল এদের সকলের উপরে। এদের আমরা ম্যানেজার বা ম্যানেজিং ডাইরেকটর বলতে পারি। কারণ এদের নির্দেশেই চাষী এবং মালিক উভয়ই পরিচালিত হতো। নায়েবরাই ছিল ডিফেকটো (Defacto জমিদার অর্থাৎ লটদার বা চকদার, ওরা খুবই প্রতাপশালী ছিল। ওরা সাধারণ লোক বা চাষী বাসীদের উপর নানা রকম অত্যাচার ও অশালীন ব্যবহার করতো, এদের দাপটে সবাই ভীত সন্ত্রস্থ থাকতো, এদের বিরুদ্ধে কেউ জমিদারের কাছে কিছু নালিশ করতে সাহস করতো না। কারণ যদি কেউ কদাপি অতিষ্ঠ হয়ে নালিশ দিতো তারতো কোন সুবিচার হতো না পরন্তু জমিদারের অবর্ত্তমানে বা অনুপস্থিতিতে নায়েবরা তাদের পার্শ্বচরদের বা পিয়াদের লোকজন দ্বারা নানা অজুহাতে অভিযোগ কারীদের নাজেহাল করতো এবং এমন সব অমানুষিক অত্যাচারের ব্যবস্থা করতো যাতে করে আর কখনও এ পথে এগুতে সাহস করতো না, তারা শেষ পর্য্যন্ত একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার নায়েবদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হতো। জমিদাররাও তাদের অন্যায় অত্যাচারের বিষয় উপলব্ধি করলেও অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে সহজে কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস করতো

না। কারণ তারা ভালভাবে জানতো যে নায়েবকে চটাতে গেলে তাদের জমিদারী বাঞ্চাল হয়ে যাবে। তবে দুই একটা ক্ষেত্রে খুব নিষ্ঠাবান প্রজাদরদী জমিদার ছিল যারা নায়েবদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অপসারন বা স্থানান্তর প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। যা হোক, এই নায়েব নামধারী ব্যক্তিগণ নি:সঙ্গভাবে বেশীদিন থাকতে পাবে নি। তারা জমিদারেব নিকট থেকে যৌতুক স্বরূপ বা পারি-শ্রমিকের বিনিময়ে কিছু জমি নিজ নামে নিয়ে নিজেদের পরিবার বর্গকে নিয়ে এসে সুবিধামত স্থানে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। পরে বিভিন্ন অসৎ উপায়ে তাবা বহু জমিব মালিক হয়েছে এবং অনেকে কিছুদিনের মধ্যে নিজের মালিকের চেয়ে অধিক বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। তবে দুচার জন জনপ্রিয় নায়েব যে ছিল না তা নয়, নায়েবদের পরবর্ত্তী গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকাবী ছিল গোমস্তা। এদের আমরা হিসাবরক্ষক করনিক বলতে পারি। এরা জমিদারী সেরেস্তাব জমা খরচের হিসাব লিখতো। খাজনা আদায় কবতো এবং নায়েব বাবুদের ফায়ফরমাস খাটতো। নায়েবরা ছিল বড়বাবু আব গোমস্তারা ছিল ছোটোবাবু। এদের মধ্যে অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের একটা ভাগাভাগি ব্যবস্থা ছিল। নায়েবের অবর্ত্তমানে এবা নায়েবি করতো। এবং এদের প্রতাপও বড় কম ছিল না। এরাও নায়েব বাবুদের পদাঙ্ক অনুসরণ কবে পরিবারের লোকজন নিয়ে এসে সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। জমিদারী শাসনযন্ত্রের সর্বনিম্ন পদে ছিল পেয়াদা, এরা ছিল শক্তিশালী লেঠেল। এরা লাঠি চালনা জানতো। এদের কাজ ছিল অনেকটা আজ্ঞাবাহী দারোয়ানের বা দূতের মত. এরা নায়েব গোমস্তার আজ্ঞাবাহী। এরা কাছাড়ীর বিষয় সম্পদ পাহারা দিত এবং নায়েব গোমস্তা বাবুরা যখন যাকে ধরে আনতে বলতো তখন তাদের প্রয়োজন হলে শারীরিক বল প্রয়োগ করে ধরে নিয়ে আসতো। আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের প্রহার করতো। আর অন্য সময় গাঁজা বা মদ প্রভৃতি নেশা করে অঘোরে

ঘুমিয়ে পড়ে থাকতো। এরাও কালক্রমে স্থায়ীভাবে সুন্দরবনের অধিবাসী হয়ে গেছে। আর লস্কর বলতে আমরা চাকর—বাকর বা গৃহভৃত্য বুঝি। এরা রান্না-বান্না থেকে আরম্ভ করে সব রকম কাজ করত। কাছাড়ীতে থাকতো। এরা ছিল সব থেকে নিরীহ প্রকৃতির লোক। এরাও কিছুদিন থাকার পর বিবাহাদি করে বংশ বিস্তার করে এবং কেউ কেউ আবার স্ত্রী ও ছেলেপুলে নিয়ে এসে বাস করতে করতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে।

এই সব শ্রেণীর লোক ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে কিছু সমাজ-বিরোধী ব্যক্তি, চোর, ডাকাত, ফেরার আসামী, খুনী প্রভৃতি লোক নিজেদের আত্মগোপন করার জন্য যোগাযোগ হীন এই সুন্দরবন অঞ্চলে এসে নিরাপদে বাস করতো। তারা ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলের অধিবাসী হয়ে গেছে। কতিপয় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে আত্মগোপন করে এই অঞ্চলে বসবাস করতো, তারাও পরে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। আর পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান রায়টের সময় কিছু উদ্বাস্তু সরকারী ব্যবস্থাপনায় কলোনী স্থাপন করে থাকার ব্যবস্থা করায় এখন তারা স্থায়ীভাবে বাস করে। আবার কিছু লোক বিভিন্ন ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসে এখানে স্থায়ী-ভাবে আছে। সুতরাং আমরা এখন তাহলে এইটুকু বুঝতে পারছি যে সুন্দরবনের আদিম আদিবাসীরা খুব উন্নত শ্রেণীর ব্যক্তি ছিল না। তারা স্বাভাবিক ভাবে সমাজ বিরোধী ও অত্যাচারী প্রকৃতির লোক ছিল। এদের স্বভাব চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। ওদের শিক্ষা দীক্ষা বলতে কিছুই ছিল না। অত্যন্ত নিচুমানের ছিল এদের নৈতিক চরিত্র। এখনও জানা যায় যে বর্ত্তমান যারা খুব বিত্তশালী জোতদার শ্রেণীর লোক তাদের পূর্বপুরুষগণ হয় ডাকাতি বা রাহাজানি করত নয়ত নীতিভ্রষ্ঠ অত্যাচারী নায়েবী বা গোমস্তাগিরি করত। সুন্দরবন অঞ্চলে যেমন কিছু কিছু সমাজবিরোধী ব্যক্তি এসেছিল তেমনি কিছু নারী বিভিন্ন চকদার, লাটদার, নায়েব, গোমস্তার রক্ষিতা

রূপে থাকার জন্য এসেছিল। তাদের বহু ছেলে মেয়ে জন্মেছিল। তারাও পরে রক্ষকের অনুগ্রহ লাভ করে এখানে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করছে। কারণ তারা আর সভ্য সমাজে ফিরে আসতে পারেনি। স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্বে বা তার ঠিক পরে এই অনুন্নত ও অবহেলিত সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ফলে বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপিত হয়েছে। পূর্বে যখন পরস্পর বসবাস ও বিবাহাদির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তখন কিছু কিছু পাঠশালা গড়ে উঠেছিল। সেখানে মোটামুটি আক্ষরিক জ্ঞান দিবার জন্য কিছু লোক মেদিনীপুর থেকে এসে এইসব পাঠশালায় পণ্ডিতগিরি করেছে। তারা একটু লেখাপড়া জানায় সকলের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেছে এবং বেশ কিছুদিন থাকার পর জমি জায়গা সস্তা দামে কিনে বসবাস করতে করতে স্থায়ী হয়ে গেছে। তারপর যখন সরকারী প্রচেষ্টায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তখন ডিগ্রীধারী স্কুল-ফাইন্যাল থেকে বি. এ., এম. এ., পর্যন্ত শিক্ষকদের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। অথচ স্থানীয় কোন উপযুক্ত ডিগ্রীধারী ব্যক্তি না থাকায় মেদিনাপুর. হাওড়া এবং পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পল্লীর বহু সংখ্যক লোক সুন্দরবন অঞ্চলে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত এসেছে এবং যোগাযোগের অসুবিধার জন্য তারাও অনেকে সুন্দরবন অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেছে। বর্ত্তমান সুন্দরবন তাই বহু শ্রেণীর মানুষের আবাস স্থল হয়ে উঠেছে।

কলিকাতার খুব কাছাকাছি হওয়ায় এবং কলিকাতার সহিত সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা হওয়ায় এখন সুন্দরবনের অতি দুর্গম স্থানেও সভ্যতার আলোক ছড়িয়ে পড়েছে। বতমান সমাগত শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসে অনুন্নত তপশীল শ্রেণীভুক্ত আদিম অধিবাসীর বংশধরগণও এখন সভ্য জীবন যাপন করতে শিখছে। আরও দুই তিন দশকের মধ্যে এরা একটি সুসভ্য সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হবে।

এখন তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক বাস করতো চকদার এবং বর্গাদার। চকদাররা ছিল বিত্তশালী ভূস্বামী আর বর্গাদাররা ছিল ভূমিহীন কৃষক। আর স্বাধীনতা উত্তর যুগে জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়ার পরে লটদার বা চকদার আইনতঃ আব কেউ নেই। এখন আছে ছোট বড় জোতদার আর বর্গাদার। বর্গাদারদের এখনও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ পাবিবর্তন হয়নি। এরা ছাড়া বহিরাগত শিক্ষক, চিকিৎসক, চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ী এখন সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ী ও অস্থায়ী হিসাবে বাস করে। জোতদারদের প্রধান জীবিকা ধান ও মৎস্য চাষ, এদের ছেলেমেয়েরা এখন কিছু কিছু বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন অফিসে চাকুরি করে জীবিকা অর্জন করছে। তবে এই সব পরিবাবের ছেলেমেয়েরা চিকিৎসক হবার এখনও সুযোগ পায়নি, আইন বা অন্যান্য পেশায় এখনও আগ্রহী নয়। বর্গাদারদের ভাগ্যে জমি চাষ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, এদেব ছেলেমেয়েরা এখন উচ্চ শিক্ষা লাভ করার কোন সুযোগ পাচ্ছে না, ৭৫ ভাগ ধান নিয়েও তাদের অনাহারে অর্দ্ধাহারে কালাতিপাত করতে হয়। দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, এর জন্য অবশ্য এরা নিজেরাও অনেকাংশে দায়ী, যখন ধান চাল বাড়িতে থাকে, তখন বেহিসাবী ব্যয় করে। এরা এখন অধিকাংশ তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় এদের আচার ব্যবহার খুবই অমার্জিত। এখনও বাজে নেশা করে পয়সা নষ্ট করে, অনেকেব নিজস্ব বাড়ি নেই, অপরের আশ্রয়ে থাকে, সরকারী জমি বিলি এদের কাছে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কারণ যে ঘর বাড়ি সরকারী আর্থিক আনুকূল্যে তৈরী হয়েছে, সেখানে সরকারের দেওয়া অর্থ ঠিক মত কাজে লাগান হয় নি। যাব ফলে সুন্দরবন অঞ্চলেব ঘূর্ণিবাত্যায় এক বৎসবেব মধ্যে তা ভূপাতিত হয়েছে। তা সংস্কার করার মত তাব আর কোন সংস্থান নাই। জমি যা চাষের জন্য পেয়েছিল অনেকে হাল লাঙ্গল

ও বীজ। ধানের অভাবে চাষ করতে পারেনি, দেনার দায়ে তা বাঁধা দিয়েছে। এখন একটি বাস্তবানুগ সমীক্ষা করলে সরকারী অবাস্তব পরিকল্পনার স্বরূপ প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে বর্গাদারদের যে অবস্থা ছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তার আরও অধিকতর অবনতি হয়েছে। তার প্রধান কারণ, পূর্বে সুন্দরবনে লোক সংখ্যার তুলনায় ধান, মাছ, দুধ সবই বেশী উৎপাদিত হতো, তাই সকলে দুবেলা পেট ভরে খেতে পেতো। এখন প্রকৃতিও খুব কৃপণ, বর্গাদাররা মাথা খুঁড়েও সারা বৎসরের জন্য কোন কাজ পায় না, তাই বৎসরের নয় মাস কোন রকম একখানা রুটি, কোনদিন আটা গোলা জল কোনদিন বা অনাহারে কাটিয়ে কাটিয়ে কঙ্কালসার হয়ে উঠেছে। এদের ভগবানই ভরসা, এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত সুচিন্তিত বাস্তবানুগ পরিকল্পনা চাই, সর্বভারতীয় কোন ছাঁচে এদের উন্নতি হবে না, এটি নদীনালার দেশ, এর প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অন্য উপায়ে অর্থ ও শ্রমের অপচয় ছাড়া অন্য কিছু কাজ হবে না। বর্গাদারদের বর্তমান সংখ্যা মোট জন সংখ্যার ৭৫ ভাগ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি বর্গা হিসাবে দু'তিন বিঘা জমি চাষ করলে এদের সারা বছরের খাদ্যের সংস্থান হতে পারে না। কারণ এখানে বিঘা প্রতি গড় ফসল ৫ মনের বেশী নয়, দুই বিঘা জমি চাষ করে একজন বর্গাদার ৭৫ ভাগ হিসাবে ৭½ মণ ধান পেতে পারে। এতে তার আবার চাষের হাল লাঙ্গল এবং বীজ ধানের খরচ আছে। কায়িক শ্রম তার নিজের, এর জন্য কোন খরচ করতে তাকে হয়নি। তথাপি এতে কি তার পরিবার (ন্যূনতম সংখ্যা ৫ যদিও হয়) চলতে পারে? কিছুতেই সম্ভব নয়, তাই এরা বহু পূর্ব থেকেই হয় নদীতে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারায়, না হয় জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের পেটে যায়, আবার মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ হারায়। হয়ত সকলে প্রাণ হারায় না, কিছু লোক কপাল

জোরে প্রাণে বেঁচে কাঠ মাছ মধু নিয়ে ফিরে আসে। এতে কিছু দিন তাদের সংসার চলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন এক মিশ্রজীবিকার উপর নির্ভর করে। এরা শুধু ধান চাষ নয়, কাঠ, মাছ ও মধু সংগ্রহ করেও জীবিকা অর্জন করে। সুন্দরবনের লোনা মাটিতে একটি মাত্র ফসল বৎসরে একবার ফলে। তাই এরা এই সহকারী জীবিকার আশ্রয় জীবনের বিনিময়েও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অনেক কাঠুরিয়া বা জেলেকে বলতে শুনি 'বাবু না খেয়ে কেন নিজে মরবো বা চোখের সামনে ছেলে মেয়ে স্ত্রীর মৃত্যু দেখবো। তার চেয়ে বনে যদি বাঘের পেটে বা নদীতে কুমীরের পেটে যাই তাতে অনেক শান্তি পাবো।' কত নিরুপায় এরা ? এদের কথা কেউ কি কোন দিন সত্যিকার সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা করে ? এদের কি এই নিষ্ঠুর অদৃষ্টের পরিহাস কোন দিন ঘুচবে না ? মানুষের জীবিকাই তার জীবনের সুখ দুঃখের মূল। সুতরাং এদের জীবিকার উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন। এদের রিলিফ খাইয়ে খাইয়ে একটা ভিখারী জাতি গড়ে তোলার অপচেষ্টার অবিলম্বে অবসান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে এদের জীবিকার উন্নয়নের মাধ্যমে। এই সুন্দরবনের সহস্র সহস্র মানুষের জন্য যদি কাঠ ও মধু সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়, মাছ ধরার যদি নিরাপদ ও উন্নত ব্যবস্থা করে দেওয়া অথবা যায় আরও অন্যান্য বনজ এবং জলজ সম্পদের সৎ ব্যবহার সম্বন্ধে এদের প্রশিক্ষন ও উপযুক্ত পবিবেশ গড়ে তোলা হয় তাহলে সুন্দরবন বাসীর জীবন প্রকৃতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। কৃষির জন্যও চাই অনুকুল ব্যবস্থা। সুন্দববনের কৃষির জন্য চাই উন্নত সেচ ব্যবস্থা। পেশাগত বৃত্তির উন্নতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের মাধ্যমে সারা বৎসবের কর্ম সংস্থান ও উপার্জনের ব্যবস্থা। তা হলে অতি স্বাভাবিক ভাবে সুন্দরবন বাসীর জীবন যাপনের মান উন্নত হয়ে উঠবে এবং জীবিকার বহু দ্বার এদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যাবে, মানুষের

জীবন যাপনের জন্য কোন জীবিকাই নগণ্য নয়, ছোটো নয়। তাহলে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সুন্দরবনের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি, মৎস্য চাষ, মধু সংগ্রহ ও কাঠের ব্যবসা। এখনও আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। তাদের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নবীকরণ ও উন্নয়ন প্রয়োজন। এগুলি জীবিকা হিসাবে মোটেই ক্ষুদ্র নয়। এদের বিরাট উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। এই জীবিকা-গুলির দ্বারা অতীতে সুন্দরবনের মানুষ সুখে ও শান্তিতে বসবাস করত, এখনও সেই সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

মানুষের জীবনের মান ও জীবিকা অনুসারে তার সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। স্থান কাল ভেদে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাব পার্থক্য পবিলক্ষিত হয়, তাই প্রাচ্যের সমাজ সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সমাজ সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদেব পার্থক্য আছে। আবার মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে হিন্দু সভ্যতাব পার্থক্য আছে। আর্য সভ্যতার সঙ্গে অনার্য সভ্যতারও যথেষ্ট ব্যবধান। সুতরাং সুন্দরবনের অনুন্নত আদিবাসী বহুল স্থানেব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অন্যান্য উন্নত জাতের ও উন্নত মানেব অধিবাসীর থেকে নিম্ন স্তরেব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে পুরা কালে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ছিল। তার বহু প্রত্নতাত্বিক প্রমাণ বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুন্দরবনে যে সব প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে তার সবই প্রায় পাল ও সেন যুগের। গুপ্ত যুগেবও কিছু কিছু মুদ্রা প্রভৃতি নির্দশন পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগেব পব মাৎস্যন্যায় শাসন ব্যবস্থা চলে তা আমরা ভারতের যে কোন ইতিহাস পাঠ করলে জানতে পারি। তারপর শুরু হয় পাল রাজত্ব। সুন্দর বনের ১১৬নং লাটে যে ১০০ ফুট উচ্চ জটার দেউলের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা পাল যুগে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের সন্নিকটে যে তাম্র পট্টলিপি পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় এই মন্দিরটি ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। পাল যুগের অবসানের পর সুরু হয়

সেন যুগ। যতদূর জানা যায় আলিপুর, ফলতা, কুলপী, প্রভৃতি সেনরাজ্য ভুক্ত ছিল। সেন রাজত্বের পতনের পর আরম্ভ হয় পাঠান যুগ। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত শাহী মসজিদ বসিরহাটে এখনও বিদ্যমান। পাঠান যুগের পর সুরু হয় মোগল যুগ। এ সময় সুন্দর-বনের উত্তরাঞ্চলে মোগল শাসন প্রবর্তিত হলেও দক্ষিনাংশ ছিল গহণ অরণ্যে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলে মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুর ঘাঁটি ছিল। এদের নিদারুন অত্যাচারে ভাগীরথীর নিকটবর্তী জনপদগুলি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল। তারপর যতদূর জানা যায়, ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২টি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যা হোক, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, প্রাচীন সুন্দরবনে একটা উচ্চতর সংস্কৃতি ছিল। কালক্রমে তা লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আধুনিক সুন্দরবনে জনবসতি স্থাপিত হওয়ার পর একটা নূতন সমাজ গড়ে উঠেছে, নূতন সমাজের সঙ্গে একটি নূতন সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে। এ সংস্কৃতিকে আমরা আরণ্যক সংস্কৃতি বলতে পারি। আরণ্যক সংস্কৃতি বলতে আমরা আদিম সংস্কৃতিকে বুঝাতে চাই না। অর্থাৎ সুন্দরবনের সমাজ আদিম যুগের বর্বর সমাজ নয়। আমমাংস খাদক বা কাঁচা মাংস ভক্ষণ কারী মানুষের সমাজ বা সংস্কৃতি নয়। সুন্দর-বনের মানুষ অরণ্যের ব্যাঘ্র কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে মোম মধু ও মাছ সংগ্রহ করে এবং অন্যদিকে প্রতিকুল প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে যে জীবনাচরন গড়ে তুলেছে তাকেই আমরা আরণ্যক সংস্কৃতি বলতে চাই। কারণ এই সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে নাগরিক সংস্কৃতির অনেক ফারাক। এই সমাজ গড়ে তুলেছে প্রধানতঃ অসংখ্য আদিবাসী। এখানে এসেছে ওরাং, মুণ্ডা, সাঁওতাল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি বহু নিম্ন শ্রেণীর উপজাতি। এদের জীবন যাপন প্রণালী, আচার আচরণ পূজাপদ্ধতি সবই নাগরিক সংস্কৃতি থেকে পৃথক। হয়ত সম্প্রতি কিছু কিছু শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষ সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে বসবাস করছে। কিন্তু তাদের

সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাই সংখ্যা গরিষ্ঠ আদিবাসী জেলে, কাঠুরিয়া বর্গাদার প্রভৃতির দ্বারা গড়া বা পরিচালিত সমাজই সুন্দরবনের সমাজ এবং তাদের খাদ্যাভাস, আচার আচরনই আরণ্যক সংস্কৃতির ভিত্তি। এরা কোন বৈদিক আচার মানে না। কোন বৈদিক দেবদেবীর পূজা করে না এরা পূজা করে সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী। এদের পূজা দিলে জঙ্গলের বাঘ, কুমীরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরা এখনও প্রচুর নেশা করে। দল বেধে মাদল বাজিয়ে নৃত্য করে। বলীর মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। এদের প্রিয় খেলা 'ঘোড়ছুট' প্রিয় পূজোপকরণ হাঁস, মুরগী বা পাঠার বলী। বাস করে জঙ্গলের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে। মাছ ধরে, কাঠ কাটে।

॥ ৩ ॥

পৌণ্ড, ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র সমাজ

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমগ্র ভারত তথা বঙ্গদেশের মত সুন্দরবনে প্রধানতঃ দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক পাশাপাশি বাস করতো। হিন্দু মুসলমান ভারত মাতার দু'টি সন্তানের মত সুন্দরবনের বৃন্তে দু'টি কুসুম রূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। জেলে, মৌলে ও বাউলের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় দেখতে পাবো সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতির উপরে হিন্দু মুসলমানের যৌথ এবং সংমিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বা পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় এরূপ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না। বনবিবির পূজা সুন্দরবনের এই সংমিশ্রিত সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঘুটিয়ারী শরিফে সীরনী দেওয়ার প্রথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ পূজা এরূপ একটি সর্বভারতীয়

মিশ্র সংস্কৃতির পরিচায়ক বটে। কিন্তু বনবিবির পূজা একমাত্র সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য। ১৯০১ সালের আদমসুমারীর প্রতিবেদন থেকে আর একটি সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, সেক শ্রেণীভুক্ত মুসলমানগণ পৌণ্ড্র এবং নৈষধ ক্ষত্রিয় এই দুই জাতির ধর্মান্তরিত বংশধর। স্যার হার্বার্ট রিজলী সাহেবের 'Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তার মতে প্রায় ৯০ লক্ষ ব্যক্তি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও নৈষধ ক্ষত্রিয় থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। 'বঙ্গে নৈষধ বা নমঃশুদ্র নামক গ্রন্থে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বালা মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্রের নির্বাসিত পুত্র নিষধের বংশধরগণ নৈষধ ক্ষত্রিয় বা নমঃশুদ্র রূপে পরিচিত। এই ক্ষত্রিয়গণ খুব বীর্যবান ও পরাক্রমশালী ছিল। এরা কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় অশোকের পক্ষে যোগদান করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। মহাভারতের সভাপর্বে এই পুণ্ড্র জাতির কুল-তিলক মহারাজ বাসুদেব বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। ঐতিহাসিকগণের মতে এরা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য কালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। পরবর্তী কালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়, ফলে সুন্দরবন অঞ্চলে গৌরভক্ত বা বিষ্ণুভক্ত পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বা নমঃশূদ্রের সংখ্যা গরিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তার থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হয় যে সুন্দরবনের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সেক শ্রেণীর মুসলমান ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বা নমঃশুদ্রের সংখ্যাই গরিষ্ঠ ছিল। এরা যুদ্ধবিদ্যা পরিত্যাগ করে পরে কৃষিকর্ম, মধু কাঠ সংগ্রহ মাছ ধরা প্রভৃতি বৃত্তি নিয়ে সুন্দরবনের মধ্যে বসবাস করতে থাকে। এবং আধিপত্য বিস্তার করে। নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও সেক মুসলমান ছাড়া আরও দু'টি জাতি সুন্দরবনে এসে ছিল। তারা হলো কলিঙ্গী ও মাহিষ্য। কলিঙ্গ দেশ থেকে

এসেছিল কলিঙ্গী। এরা পরে কৈবর্ত রূপে পরিচিত হয়। মাহিষ্যরা এসেছিল মেদিনীপুর জেলা থেকে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তখন এক রাজার অধিনস্থ ছিল। কৈবর্ত মাহিষ্য উন্নত জাতি ছিল। কৈবর্ত দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম হয়েছিল। পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এদেরই বংশধর। রানী রাসমণি এই কৈবর্ত বা মাহিষ্য সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং সুপ্রাচীন সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি বৃটিশোত্তর সুন্দরবন অপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত ছিল। বৃটিশ বেনিয়াদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সুন্দরবনের বর্তমান অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থার জন্য দায়ী। প্রাচীন সুন্দরবন যে এক অতি উন্নত মানের সমাজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল অধুনাপ্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। সুন্দরবনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে যে বুদ্ধ, পার্শ্বনাথ ও বিষ্ণুমূর্তি শিব-লিঙ্গ কালী, সূর্য্য, ও গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে তার থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে অতি প্রাচীন কালে জৈন, বৌদ্ধ ও শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সৌর গানপত্য প্রভৃতি পঞ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত উন্নত জাতি এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। জৈন ও বৌদ্ধ যুগে সুন্দরবনের অস্তিত্ব ছিল। এর সঙ্গে শুধু ভারত নয় এবং বহির্ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময় হতো। সুতরাং উপকুলবর্তী ভাটির দেশ সুন্দরবন বা সমতট এক উন্নত সমাজ ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। তাই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"এই অঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিবাসী হচ্ছে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়। ভাগীরথীর পূর্বতীর ধরে শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্মের যে নিচ্ছিদ্র প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। তার বাইরেই এই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ, 'আপনার মধ্যে আপনি 'বিকাশি' উঠতে পেরেছিল বলেই এদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাটি অনুশীলন করার সুযোগ এরা পেয়েছে।" আমরা তাহলে এক কথায় বলতে পারি সুন্দরবনের সমাজ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের সমাজ আর সুন্দরবনের সংস্কৃতি পৌণ্ড্র সংস্কৃতি। তবে পৌণ্ড্র প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও অন্যান্য কৈবর্ত

মাহিষ্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব নগণ্য নয়। পৌণ্ড্র সমাজ সংস্কৃতি এদের প্রভাবে পরিপুষ্ঠ হয়েছে।

॥ ৪ ॥

লোক সমাজ বা আরণ্যক সমাজ

বঙ্গভূমি ও খর্বাকৃতি বঙ্গবাসীর কথা ঋগবেদের আরণ্যক সংহিতায় উল্লেখ রয়েছে। বায়ুপুরাণ, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে এই জাতির বিশেষ বর্ণনা আছে। এই সব শাস্ত্র থেকে জানা যায় চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির—নির্বাসিত পুত্র অনু বঙ্গে'র প্রথম রাজা এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণই বঙ্গে প্রথম ও একমাত্র অধিবাসী ছিলেন। ইনি সর্বপ্রথম তাম্রলিপ্তে রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজ বলি মহামতি অনুর বংশধর। বলির পঞ্চ পুত্র ছিল। তাদের নাম অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুক্ষ। তিনি জল প্লাবমান দেশ অর্থাৎ উপকুলবর্তী দেশগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পঞ্চ পুত্রের নামানুসারে পঞ্চ দেশের নামকরণ করেন এবং সেই দেশের রাজত্ব দান করেন। আরও জানা যায় যে, অনুর জৈষ্ঠ ভ্রাতা যদুর বংশধর রাজা মহিস্মান। এর সন্তান সন্ততিরা মাহিষ্য নামে পরিচিত। এর বংশের রাজকুমার বীর অযোধ্যার রাজা বাহুকে যুদ্ধে পরাজিত করে সমগ্র সুর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগকে বিতাড়িত করে। বাহু পুত্র সগর অযোদ্ধা পুনরুদ্ধার করে। এবং মাহিষ্যদিগকে বঙ্গে বিতাড়িত করে। মাহিষ্যগণ ক্ষুব্ধ হয়ে সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করে বঙ্গদেশের জঙ্গলে বাস করে। অন্য দিকে সগরের পুত্রগণ অশ্ব অনুসন্ধান করতে বঙ্গ দেশের সাগর দ্বীপে কপিলমুণির আশ্রমে এসে হানা দিলে কপিলের রোশাগ্নিতে ভষ্মীভূত হয়। পরে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন দ্বারা মৃত সগর পুত্রগণ পুনরজীবন লাভ করে। কপিল মন্দির এখনও অযোধ্যাবাসীর দখলে আছে। পূজার লক্ষাধি টাকার মূল্যের

প্রণামী প্রতি বৎসর সাগর মেলায় যা সংগৃহীত হয় তা অযোধ্যার রামানন্দ পন্থী, হনুমানগড়ী মোহন্তগণ স্বদেশে বস্তা বোঝাই করে নিয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অর্থের বিন্দুমাত্র অংশ হতেও বঞ্চিত। অথচ এই সর্বভারতীয় মেলার সমূহ খরচ প্রায় লক্ষ টাকা। প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করে থাকেন। এই ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুক্ষ বংশের বংশধরগণ সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের বংশানুক্রমে কিছু স্থায়ী প্রভাব বা চিহ্ন রেখে গেছে। রাজশেখর বসু মহাশয়ের সম্পাদিত মহাভারতের পরিশিষ্টাংশ থেকে জানা যায় যে অঙ্গ দেশ বলতে বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা বুঝায়। বঙ্গ বলতে পূর্ববঙ্গ, কলিঙ্গ বলতে মহানদী থেকে গোদাবরী পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ, পুণ্ড্র বলতে উত্তর বঙ্গ এবং সুক্ষ বলতে তাম্রলিপ্ত বুঝায়। এক কথায় বলা যায় সমুদ্রের উপকুলবর্তী জল প্লাবমান স্থান গুলিই প্রাচীন সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। এবং এই বৃহত্তর সুন্দরবন তখন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের নিকটবর্তী ২৪ পরগণার স্থানগুলি অর্থাৎ ছত্রভোগ, পাতাল গঙ্গা প্রভৃতি।

রায় দীর্ঘ সন্নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত সুন্দরবন ছিল। এর দাক্ষিণাংশ তখন জলমগ্ন ছিল। যাহোক, উপরোক্ত বিবরণ থেকে ইহা খুবই স্পষ্ট যে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ এই পঞ্চদেশের অধিবাসীগণ সবই ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। সকলেই চন্দ্রবংশীয় এবং পরস্পরের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদারের ভাষায়—"সকলে ক্ষত্রিয় হইলেও তাহাদের স্বজাতিগণ সকলেই যুদ্ধ ও কৃষি গোপালনের কর্মে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব ও শৈব, এই সমগ্র জাতি এক বর্ণভুক্ত ছিল।" —তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন—"সিন্ধু উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কুমারিকা এবং পূর্বে মানপুর ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমগ্র
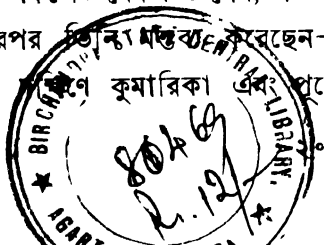
আরব্যোপসাগর ও বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী মালভূমিতে এক শ্রেণীর অতি উচ্চ শিক্ষিত, শিক্ষা বাণিজ্য ও স্থাপত্যে জগৎ বিখ্যাত জাতি বাস করত। কোন রাজনৈতিক বা নৈসর্গিক কারণে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।" গঙ্গাসাগর দ্বীপে মহর্ষি কপিলের আশ্রম স্থাপন ও সাংখ্য দর্শন প্রনয়ন প্রাচীন সুন্দরবনের উন্নত সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট প্রমান বলা যায়। বৈদেশিক পর্যাটক গনের বিবরণ থেকে জানা যায়, বঙ্গের গঙ্গারাঢ়ী কলিঙ্গীগণের নির্মিত রেশম বস্ত্র, হাতীর দাঁতের সৌখিন দ্রব্য প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে খুব আদরনীয় ছিল। গ্রীস, রোম ও মিশরের সঙ্গে ব্যাণিজ্যিক বিনিময় প্রচলিত ছিল। বার ভূইঞাদের মধ্যে প্রতাপশালী রাজা প্রতাপাদিত্যের অবদান সুন্দরবনের উন্নতবস্থার পরিচয় বহন করে। তাঁর রাজত্ব কালে নির্মিত বহু দুর্গ ও জাহাজ তৈরীর ঘাটের ভগ্নাবশেষ এখনও সুন্দরবনের বহু স্থানে দেখা যায়। এ পর্যন্ত আমরা সুন্দরবনের সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এর পরে আমরা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরবনের সমাজ জীবনের ইতিহাস অর্থাৎ সুন্দরবনের সমাজের উত্থান পতন ও অগ্রগতির ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করে এই অধ্যায়ের উপসংহার করবো। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটী মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃতি যোগ্য। তিনি বলেছেন—"প্রধানত তিনটি অবস্থাব মধ্য দিয়া সমাজ জীবনেব ক্রমবিবর্তন সাধিত হইয়া আসিয়াছে। আদিম সমাজ, লোক সমাজ ও নাগবিক সমাজ——ক্রম বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া সে সকল সমাজ অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদের প্রথম পরিবর্তিত ও উল্লেখযোগ্য রূপকেই পল্লী সমাজের রূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আদিম সমাজ জীবনের উপকরণ যেমন বর্তমান থাকে। তেমনিই ইহার পরিবর্তিত সমাজ রূপের সম্ভাবনা দেখা যায়। এই শ্রেণীর সমাজে যে সাহিত্য জন্ম এবং

পুষ্টি লাভ করে তাহাকেই লোক সাহিত্য বলা হয়. এবং এই সমাজ-কেও লোক সমাজ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে পল্লী সমাজকে লোক সমাজ বলা যায়।" তারপর তিনি বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে পাল ও সেন যুগ থেকে আরম্ভ করে পাঠান, মোগল যুগ পর্যন্ত এই লোক সমাজ বহু ভাষা ও ধর্ম মতের সংস্পর্শে এসে কিছু কিছু পরিবর্তনের মধ্যে একটি নূতন সমাজ গঠনের দিকে পদক্ষেপ করেছে। প্রাচীন পল্লী জীবনের সংগঠন ধারা বিপর্যস্ত হয়ে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বা কলকাতার নব প্রতিষ্ঠিত ধনী সম্প্রদায়ের একটি কৃত্রিম সমাজ জীবনের প্রাধান্য স্থাপিত হতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ শাসনে এই কৃত্রিম সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলল। তার ভাষায়—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মূলত বাংলার পল্লী জীবনের যে সংহতি বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল কলিকাতা মহানগরীর নূতন নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহার পরিপূর্ণতা দেখা দিল।" এর পরেই লোক সমাজ ও লোক সাহিত্য উভয় ধারাই সম্পূর্ণ শুরু হয়ে যায়। মহানগরীর কৃত্রিম অন্তঃসার শূন্য নাগরিক সমাজ সমগ্র দেশকে গ্রাস করে ফেলে। কলিকাতা মহানগরী থেকে বহুদূরে বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে যে লোক সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মণিধারা প্রবাহিত ছিল তা যন্ত্র শিল্পের প্রসারের ফলে আজ লুপ্ত প্রায়। এই দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করলে আমরা বলতে পারি যে সুন্দরবনের সমাজ একটি লোক সমাজ ; যে সমাজে লোক সাহিত্য ও লোক ধর্ম প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছিল বহু সাধারণ নিরক্ষর মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ বসবাসের ফলে। পূর্বে বলেছি সুন্দরবনের সমাজ আদিম সমাজ নয়। এ সমাজ আরণ্যক সমাজ। এখন বলতে পারি নিরক্ষর পৌণ্ড্র সংখ্যাগরিষ্ঠের লোক সমাজ। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই সুন্দরবনের সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়েছিল জমিদারের কর্মচারীদের দ্বারা। হয়েছিল কাছারী

স্থাপন এবং কাছারী শাসনই ছিল সুন্দরবনের সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। একথা আমরা পূর্বেই বিশদ ভাবে আলোচনা করেছি। তাহলে কি সুন্দরবনের সমাজকে আমরা নাগরিক সমাজ বলতে পারি? সুন্দরবনের সমাজ নাগরিক সমাজের মাপ কাঠিতে পরিমাপ করা অসম্ভব। কারণ কলকাতা মহানগরীর ছোঁয়া সুন্দরবনের পল্লীর গায়ে লাগলেও নাগরিক সভ্যতার প্রধান উপাদান যন্ত্র শিল্পের প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এখনও সুন্দরবনকে গ্রাস করতে পারে নি। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে বটে তবে এখনও ভূমিহীন বর্গাদার ভূপতি হতে পারে নি। নাগরিক সমাজ জীবনের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন তা এখনও আর সুন্দরবনে নাই। সুন্দরবনের মানুষ আজও কৃষিনির্ভর। শিল্প সভ্যতা থেকে অনেক দূরে। পশু পালন, কাঠ সংগ্রহ, মৎস্য শিকার প্রভৃতি বৃত্তিকে নির্ভর করেই সুন্দরবনের জন জীবনের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে।

কারণ সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থা এমন যে এখানে কোন বৃহৎ যন্ত্রশিল্প বা বৃহৎ বাণিজ্য গড়ে উঠা সম্ভব নয়। নদী নালায় পরিবেষ্টিত দ্বীপময় সুন্দরবনে তাই নাগরিক সমাজ গড়ে উঠা আদৌ সম্ভব নয়। লোক সমাজ না বলে আমরা সুন্দরবনের সমাজকে আরণ্যক সমাজ বলে চিহ্নিত করেছি, এর প্রধান কারণ সুন্দরবনের যে ধর্ম, যে আচার আচরণ, যে জীবন যাপন প্রণালী তা আদিম সমাজের মত এত নগ্নও নয় আবার যুগ পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে নাগরিক সমাজের কৃত্রিমতার অন্তঃসার শূন্যতায় পরিপূর্ণও নয়। বনদেবীর পূজা, বনজ মধু, কাষ্ঠ, প্রভৃতি সম্পদ ও বন্য প্রাণী সুন্দরবনের সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে থাকবে। লোনামাটির গন্ধ আর লোনা জলের স্বাদ তাদের রচনা পরিতৃপ্ত করবে। আর কলকাতার মত দ্বিতীয় মহানগরী গড়ে উঠার সম্ভাবনা সুন্দরবনে নাই। ভবিষ্যতে কপিলের মত মহর্ষির আবির্ভাব সুন্দরবনের বুকে

হতেও পারে। ঋষি তপোবনে একদা যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের সাধনা হয়েছিল তা ভবিষ্যতে হবার কোন অন্তরায় নাই। সুন্দরবন অতীতে তপোবন ছিল। তার সমাজ সংস্কৃতি ছিল আরণ্যক। গঙ্গা ভাগীরথী বিধৌত কপিল—শ্রীচৈতন্য দেবের পদস্পর্শে ধন্য এই সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি যে আরণ্যক বৈশিষ্ট্য যুক্ত তা আর বলা নিষ্প্রয়োজন।

॥ ৫ ॥

পূর্ব্বপুরুষ

এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারনা করা প্রয়োজন। ২৪ পরগণা বঙ্গ দেশের অন্তর্ভুক্ত এবং সুন্দরবন ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি বিশাল দ্বীপ। অনেক ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন এই দ্বীপের নাম ছিল শাকদ্বীপ। এই দ্বীপের অধিবাসীরা ছিল আর্য। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে শ্রীধনঞ্জয় দাস মজুমদার মহাশয় বলেছেন—"বর্তমান তমলুক তদানীন্তন ভারতের বঙ্গোপসাগরের মধ্যে একটি অন্তরীপ ছিল মাত্র, ইহার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ব্রহ্ম দেশের পশ্চিম ও বর্তমান আন্দামান দ্বীপের উত্তরে ; কোকো ও প্রেফিস দ্বীপ সহ বর্তমানে ২৪ পরগণা জেলা লইয়া শাকদ্বীপ বা শাকল দ্বীপ বিদ্যমান ছিল। এই দ্বীপ অতীতের ভূমিকম্পের ফলে বর্তমানে উৎখাত হইয়া গিয়াছে।" তাঁর মতে বাংলার শাকদ্বীপ ছিল ভারতেব আর্য সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। আর এই সংস্কৃতির প্রাণ পুরুষ মহর্ষি কপিল ও বেদব্যাস। কারণ দুই মহর্ষির জন্ম স্থান ছিল তাঁর মতে বাংলার শাকদ্বীপ। ভূকম্পের ফলে শাকদ্বীপ ধ্বংস প্রাপ্ত হলে এই দ্বীপের অধিবাসীগণ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। রাজপুতগণের কারিকা ও কুলপঞ্জী থেকে জানা যায়, রাজপুতগণ বঙ্গে শাকদ্বীপের অধিবাসীদের বংশধর, মেগাস্থানিস, ডিওডোরাস প্রভৃতি পর্যটকগণের বিবরণী উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে "গঙ্গার মোহনায় একটি প্রকাণ্ড

দ্বীপ আছে, এই দ্বীপে মঙ্গো কলীঙ্গগণ বাস করেন। মঙ্গো কলিঙ্গ এবং গঙ্গাবাড়ি কলীঙ্গগণ একই জাতির দুইটি শাখা মাত্র, শাস্ত্রে কপিল ঋষির আশ্রমকে এই দ্বীপে অবস্থিত বলা হইয়াছে। তখন কুলঙ্গী হইতে সোজাবাগের হাট পর্য্যন্ত সমুদ্রের তট ছিল। চন্দ্রকেতু গড় এই তটে অবস্থিত ছিল। সুতরাং ঐ দ্বীপটির ভাঙ্গনের ফলে সমুদ্র তীর সমতটে পরিণত হয় এবং হাওড়া, হুগলী ও কাঁথির উৎপত্তি হয় বলিয়া মনে হয়।" তিনি আরও মন্তব্য করেন যে—"বর্তমান ২৪ পরগণার এই স্থানে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও বাগদীগণ মাত্র একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে বাস করিয়াছে। মাহিষ্যগণও মেদিনীপুর জেলা হইতে আসিয়া ঐ সময় হইতে এখানে বাস করিতে থাকে, মুসলমান ও কায়স্থগণ মোগল রাজত্বের শেষ সময়ে এইখানে বাস করিয়াছে, একমাত্র বসিরহাট মহকুমার অধিবাসীগণ প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে বাস করিতেছে।" তাঁর অনুমান গুপ্ত রাজত্বকালে এই শাক-দ্বীপটির ধ্বংস হয়েছে। গুপ্তবংশের সমুদ্রগুপ্ত নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত গঙ্গারাঢ়ী রাজবংশধর শাক বা শাকল দ্বীপে সর্বপ্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। এজন্য ঐ রাজার বংশকে গুপ্তবংশ বলা হয়। তাঁর মতে "এই রাজবংশের রাজ্য শাকদ্বীপ ভূকম্পে বিধৌত হইয়া গেলেও তাহাদের রাজধানী ও কপিল মুনির আশ্রম বিধৌত হয় নাই। কারণ স্থানগুলি গঙ্গার মোহনার সন্নিকটে ছিল। রাজাগণের রাজধানী ছিল বর্তমান বেড়াচাপার নিকটবর্তী দেবালয় গ্রামে অবস্থিত। এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষকে এখন চন্দ্রকেতু গড় নামে অভিহিত করা হয়। এই ধ্বংস প্রাপ্ত রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে মাহিষ্য সমাজে এই রাজগণের এবং তাহাদের রাজধানীর বহু কীর্তিকলাপ গানে ও গাঁথায় প্রচারিত আছে। গুপ্ত রাজগণের নৌবন্দর এখন জাহাজ ঘাটা নামে একটি গ্রামে পরিণত হইয়াছে।" তিনি আরও বলেন যে এঁদের দ্বারা ইন্দোনেশিয়ার বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং এই রাজবংশের শৈলেন্দ্র—সুমাত্রা ও বর্মীদ্বিপে রাজধানী স্থাপন

করেন। এই বংশের রাজাগণ এই গড়ে জাহাঙ্গীরের সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজা চন্দ্রকেতু মোগল সৈন্যের নিকট পরাজিত হয়ে সমুদ্র মধ্যে স্ত্রী-পুত্রসহ আত্মহত্যা করে যাহোক, তিনি মনে করেন যে বঙ্গের শাকল দ্বীপই সুন্দরবনের সাগর দ্বীপ। এবং ধ্বংস প্রাপ্ত শাকল দ্বীপের অধিবাসীরাই পরাক্রমশালী মাহিষ্য বাংলার ক্ষাত্রিয় মাহিষ্য ও সমগ্র ভারতের রাজপুত জাতি পুরাণাদি শাস্ত্র মতে মাহিষ্য, কৈবর্ত, ও রাজপুত ক্ষাত্রয়ের ঔরসে বৈশ্য গর্ভজাত সন্তান। সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে মাহিষ্য অর্থে রাজপুত্র।—(মহি+ ঈশ+অষ=মাহিষ্য)। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হয় যে মাহিষ্য অতি প্রাচীন জাতি এবং সুন্দরবনের আদি অধিবাসী। ইহাদের প্রভাব সুন্দরবনের সমাজে অনস্বীকার্য। আর বঙ্গদেশ যেহেতু আর্যাবর্তের মধ্যে অবস্থিত, অতএব বাঙ্গালীরা ছিল আর্য। অনার্য বা দ্রাবিড় গোষ্ঠী-ভুক্ত নয় সুতরাং সুন্দরবনের সমাজ আর্য সমাজভুক্ত বলা যায়। দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে আর্যাবর্তবাসী মাত্রই আর্য। ঋগ্বেদে অবশ্য আর্য শব্দের অর্থ হিন্দু। কপিল যেহেতু বাঙালী এবং তার সাধন ক্ষেত্র সাগর দ্বীপ। সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতিকে আর্য সমাজ ও আর্য সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা অসঙ্গত হবে না। ব্রাহ্ম সমাজের মত এ সমাজ কোন ধর্মীয় সমাজ নয়। এ সমাজ একটি জাতির সমাজ। একটি জাতি কৃষ্টির ধারক ও বাহক। 'শকহুন দল পাঠান মোগল' এই সমাজে লীন হয়ে যে নূতন সমাজ সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে আছে এক পরাক্রমশালী সুসভ্য জাতি। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাংলার নদনদী' নামক গ্রন্থ থেকে কতিপয় মূল্যবান পংক্তি আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন—"চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমানে সমৃদ্ধ ঘন বসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। জয়নগর থানায় কাশীপুর গ্রামের সূর্য্যমূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক) ডায়মণ্ডহারবারের প্রায় ২০

মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক) এবং ১৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে মলয় নামক স্থানে প্রাপ্ত জয়নাগের তাম্র পট্টোলী (সপ্তম শতক); রাক্ষসখালী দ্বীপে প্রাপ্ত ডোম্মন পালের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক), ঐ দ্বীপেই প্রাপ্ত লিপি উৎকীর্ণ এক ঝাঁক মাটির শীলমোহর (একাদশ শতক), খাড়ি পরগণায় প্রাপ্ত অসংখ্য পাথরের মূর্তি, দুই চারিটি ভগ্ন মন্দির, কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা, ইত্যাদি চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নভূমিতে প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত বহন করে। সেন রাজাদের ও ডোম্মন পালের আমলে খাড়ি মণ্ডল ও খাড়ীবিষয় পুণ্ড্র ধর্মভুক্তির অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বিভাগই ছিল।" তিনি আরও বলেছেন যে, "ষোড়শ শতকের শেষের দিকে প্রতাপাদিত্য যশোরে সুন্দরবন অঞ্চলেই নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।" 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' সতীশ চন্দ্র মিত্র ও 'হিজলীর মসনদ ই আলা' গ্রন্থে মহেন্দ্র নাথ করণ মহাশয় একই মন্তব্য করেছেন—"ভাগীরথীর মুখে সাগর দ্বীপে প্রতাপাদিত্যের প্রধান দুর্গ ও নৌসংস্থান ছিল। তা ছাড়া প্রতাপাদিত্যের তৈরী গড় দুর্গ ও জাহাজ নির্মাণের ঘাঁটি ২৪ পরগণার নানাস্থানে পাওয়া যায়। উত্তরে জগদ্দল হইতে বেহালা, সরশুণা আর দক্ষিণে আমতলা হইতে সাগর দ্বীপে আজও জঙ্গল ভগ্নজীর্ণ হইয়া মাটির তলায় ঢাকা পড়িয়া আছে।" উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে বুঝা যায় সেইকালে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের সীমানা যশোর থেকে সাগর দ্বীপ এবং বেহালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'বাংলা দেশের ইতিহাস' থেকেও প্রমাণিত হয় যে সুন্দরবন সমৃদ্ধ জনপদপূর্ণ লোকালয় ছিল। তাঁর ভাষায়—"সুন্দরবন অঞ্চলে যে এককালে সমৃদ্ধ জনপদপূর্ণ লোকালয় ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—ফরিদপুর জেলায় অন্তর্গত কোটালি পাড়ার বিল অঞ্চলে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নগরী, দুর্গ ও বন্দর ছিল। তথায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া

যায়। এই ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন সুন্দরবনের ধ্বংসের কারণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি, বাংলার নদনদী গ্রন্থে নীহার রঞ্জন রায় মহাশয় নিম্নরূপ কারণ নির্দেশ করেছেন—"১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় ফতেহাবাদ সরকারের অসংখ্য ঘরবাড়ি নৌকা এবং দুই লক্ষ লোক নষ্ট হইয়া যায়, ইহার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উন্মত্ত হত্যা লুণ্ঠন লীলা। এবং তাহার ফলে বাখরগঞ্জ এবং খুলনার নিম্নভূমি একেবারে জন-মানবহীন গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া গেল। বেনেলের নকশায় (১৭৬১) দেখা যাইবে, বাখরগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়িয়া লেখা আছে, "মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন শহর "(Country depopulated by the Maghs)" হ্যামিলটন সাহেবের বিবরনী থেকে জানা যায় যে, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ আরাকান রাজের সাহায্যে সাগর দ্বীপে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। তাদের লুণ্ঠন ও দৌরাত্মের ভীষণতায় জনবহুল সুন্দরবন জনমানবহীন হয়ে পড়ে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রনিকল থেকেও জানা যায় ১৭১৭ সালে মগ জলদস্যুরা ১৮০০ জন নারীপুরুষ ও শিশু ধরে নিয়ে যায় এবং বাজারে ২০ থেকে ৭০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করে। আরাকানরাজ তাদের $\frac{১}{৪}$ অংশ কারিগর রূপে নিয়োগ করে। অষ্টাদশ শতকে এইভাবে সুন্দরবন প্রাকৃতিক ও পাশবিক অত্যাচারের কারণে জনমানব শূণ্য দ্বীপে পরিণত হয়। ১৬শ ও ১৭শ শতকে এই ধ্বংস লীলার সূত্রপাত হয়ে ১৮শ শতকে যবনিকা পতন হয়। নদী বহুল সুন্দরবনের সমাজ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ঠিক বাংলা-দেশের মত। বাংলাকে যেমন নদীমাতৃক দেশ বলা হয় সুন্দরবনকে ঠিক সেরূপ নদীমাতৃক অঞ্চল বলা যায়! পশ্চিমে হুগলী নদী থেকে আরম্ভ করে মেঘনা পর্য্যন্ত বহু ছোট বড় নদী সুন্দরবনকে মাতৃস্নেহে লালনপালন করেছে। লোনা জলের মাছ আর মিষ্ট জলের কৃষিজাত ধান্য সুন্দরবনবাসীর কাছে এক বিরাট আশীর্বাদ। আবার একই

নদী অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে প্রবল বন্যায় বা জলোচ্ছ্বাসের সময়। ভাঙ্গা-গড়ার নিরন্তর কাজ চলেছে নদীর দুই কুলে। কমনীয় জমি মাটিতে গড়ে উঠেছে কত নূতন দ্বীপ, গড়ে উঠেছে নদীর মোহনায় কত নূতন সমাজ। সুন্দরবনের বর্তমান সমাজের বয়স এখন দুই শতাব্দী পূর্ণ হয় নি। কলিকাতা মহানগরীর বিশিষ্ট টালিগঞ্জ এখনও দুইশত বৎসরে পদার্পণ করতে পারে নি। এই টালীর নালা ও টালীগঞ্জের জন্ম হয় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন কর্নেল টালী সাহেব আদি গঙ্গায় শুষ্ক প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা করেন নূতন খনন কার্যের মাধ্যমে। টালীগঞ্জও বর্তমান ফ্রেজারগঞ্জের মত একটি গঞ্জ ছিল। সেখানে হতো সমুদ্রের মাছ ধরার খোঁটি আর বসতো মাছ ধরার জন্য জেলেদের মেলা। ডিঙ্গি, নৌকা প্রভৃতি থাকত সারিবদ্ধ হয়ে আদি গঙ্গার দুই কুলে। তাম্রলিপ্ত বন্দর তখন ছিল জীবন্ত। ফ্রেজার-গঞ্জের ইতিহাস শতবর্ষের ইতিহাস। কিন্তু তাম্রলিপ্তের ইতিহাস অতি প্রাচীন। তাম্রলিপ্ত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নাম। এই বন্দরের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযুগের স্মৃতি বিজরিত। হয়ত তাম্রলিপ্ত বন্দর সুক্ষ্ম দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন বাংলাদেশের জন্ম হয় নি তখন এই বন্দরের অস্তিত্ব ছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের "বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থের কয়েকটী পংক্তি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন,—

"প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলাদেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না, ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর-বঙ্গে পুণ্ড্র ও বারেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গ-সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। উত্তর- ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। এই সমুদয় দ্বারা দেশের সীমা ও বিস্তৃতি নির্ণয় করা যায় না।" তারপরে বলেছেন— হিন্দুযুগের শেষ আমলে বাংলাদেশ গৌড় ও বঙ্গ প্রধাণতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় ও বরেন্দ্রী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান যুগের শেষ ভাগে গৌড় দেশ সমস্ত

বাংলাকেই বুঝাইত," এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেছেন যে—"হিন্দু-যুগ অর্থে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে, অর্থাৎ যখন বাঙালী বলিয়া একটা পৃথক জাতির সমষ্টি অভ্যুদয় হয় নাই—যখন বাংলার জনপদ যাহারা গুহায় বাস করিত তাহাদের মধ্যে ভাল থাকাব ও সামাজিক জীবনের কোন একটি বন্ধন বা আদর্শগত ঐক্য দেখা দেয় নাই. সে যুগে উপরিশিষ্ট অ-বাঙালী আর্য সমাজই সর্ব বিষয়ে আধিপত্য করিতেছিল। ঐ মুসলমান যুগে, অর্থাৎ সেন রাজাদের রাজত্বকালের পর হইতেই একটা দেশ বা জাতি সমগ্রতার আভাস পাওয়া গিয়াছিল এইজন্যই বোধ হয় একটা নামেই ঐ বাংলা বা বাঙ্গলা নামে তাহাকে নির্দ্দেশ কবা সহজ হইয়াছিল, "এর পব তিনি বাঙালী জাতির আদি পরিচয় দিবাব জন্য পুনরায় ডঃ মজুমদারের 'বাংলার ইতিহাসের' আশ্রয় গ্রহণ কবেন, "বাংলার আদি প্রাচীন জনপদের নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন. পুণ্ড্র একটা জাতির নাম—ইহারা উত্তরবঙ্গে বাস করিত. ঐ বঙ্গ নামও খুব প্রাচীন। এই দুই দেশই বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত ছিল," প্রাচীন বাংলার এই পুণ্ড্র নামে একটি প্রাচীন জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা পরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, ইহারাই প্রাচীনতম সমাজের একটা বড় অঙ্গ, কোল শবর, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি এই আদিম অধিবাসী-দের বংশধর। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়—"বাংলাদেশে কোল, শবর খুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়, ইহারাই আদিম অধিবাসীদের বংশধর। ভাষার ঐক্য হইতে ইহাদের জাতিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এই মানব গোষ্ঠীকে 'অস্ট্রো এশিয়াটিক' অথবা অস্টিক, এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্বে ও দক্ষিণ এশিয়ার এই জাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশী"। তিনি আবও বলেন—"প্রাচীন বাঙালী জাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই ইহা এক প্রকার সর্ববাদী সম্মত। আর দ্রাবিড়

নামে কোন পৃথক জাতির অস্তিত্বই পণ্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন না।" এই সব উক্তি বা সিদ্ধান্তগুলি আদিম বাঙ্গালী জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমান বাঙালী যাহারা বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বাস করে তাদের জাতি-তত্ত্বের পরিচয় কি? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উঠে। এই সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন—"এই সকল জাতিকে পরাভূত করিয়া বাংলাদেশে যাঁহারা বাস স্থাপন করেন, এবং যাঁহাদের বংশধরেরা প্রধানতঃ বর্তমান বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য. কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ, তাঁহারা যে বৈদিক আর্য্যগণ হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই" এই মন্তব্যের তিনি নিম্নোদয় যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।—"বৈদিক আর্যাগণ যে যে প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ দীর্ঘশির। কিন্তু বাংলার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই প্রশস্তশির।" "মস্তিষ্কের গঠন প্রনালী হইতে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ঠ জাতি। এমন কি, বাংলাদেশের ব্রাহ্মনের সহিত অপর কোন দেশের ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, সদ্‌গোপ কৈবর্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।

শ্রীমোহিত লাল মজুমদার মহোদয় উপরোক্ত ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন যে. "বাঙালী আর্যই বটে কিন্তু ভিন্ন জাতীয় আর্য্য"।···ইহাই বাঙালীর জাতি পরিচয়ের ব্রহ্মতত্ত্ব —নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের কল্যাণ হউক। এই যে বিশিষ্ট জাতি এবং ব্রাহ্মণ হইতে সদ্‌গোপ, কৈবর্ত পর্যন্ত একটি ঘনিষ্ট রক্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান—ইহাই বাংলার জাতি সৃষ্টির মূল কথা। সুন্দরবন যেহেতু বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সুন্দরবনের আদিবাসী বাঙালী জাতির একটি বৃহত্তম অংশ—সেহেতু সুন্দরবনের সমাজ জীবন ও তার রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহারকে জানতে হলে বাঙালী ও বাংলাদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সমাজ কাঠামো বিশেষরূপে জানা প্রয়োজন।

একটি সুচিহ্নিত ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আঞ্চলিক শ্রেণী বা সমাজ। তার ভাষা ও জীবনাদর্শ সম্যকভাবে বুঝতে হলে একটি তুলনামূলক আলোচনা সর্বক্ষেত্রে অবসম্ভাবী হয়ে পড়ে। আমরা তাই এখন ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ভিত্তিতে একটি তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

বিশেষজ্ঞদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব তিনশত ও খ্রীষ্টের জন্মের পর তিনশত, মোট এই ছয়শত বৎসরের বাংলার ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, যতদূর জানা যায় গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে এই সময়ের মধ্যে গঙ্গারিডিগণ এদেশে রাজত্ব করতো। একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এদের ইতিহাস অর্থাৎ এদের রাজবংশ এবং রাজ্য-শাসননীতি প্রভৃতি কিছু বিশেষভাবে জানা যায় নি। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণানুসারে গঙ্গারিডির সঙ্গে প্রসিঅয় নামে অপর একটি জাতিও বাংলাদেশে বাস করতো। গঙ্গারিডি জাতি একটি পরাক্রমশালী জাতি ছিল এবং এরা প্রসিঅয় জাতির সহিত একটি যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সমবেতভাবে এই দুইটি জাতি আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়ে বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। ডায়োডোরামের মতে এই জাতিদ্বয়ের বিশাল হস্তীবাহিনীর ভয়ে আলেকজাণ্ডার সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে ভারত পরিত্যাগ করে। ঐতিহাসিকদের মতানুসারে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ অর্থাৎ ৩২৬-২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকেই বাংলার প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়, গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের রচনা থেকে। এর পূর্বের ইতিহাস অন্ধকারপূর্ণ। মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণাদি থেকে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বেদে কোন উল্লেখ নাই। তবে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম উল্লেখ দৃষ্ট যে ঐতেরীয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র ও শবর জাতিকে দস্যু নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পুণ্ড্ররা তখন উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ) বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ)

এবং সূহ্ম (পঃ বঙ্গ) ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের মহাভারতের ম্লেচ্ছ এবং ভাগবত পুরাণে সূহ্মবাসীদের পাপাচারীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে বঙ্গ ও সূহ্ম দুইটি অঞ্চলের উল্লেখ আছে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে বৈদিকযুগের পূর্বে বঙ্গবাসীর অস্তিত্ব ছিল। আর্যগণ যখন বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করে তখন বঙ্গদেশে একটি মনুষ্যগোষ্ঠী বসবাস করতো। সুন্দরবন অঞ্চলেও তৎকালে এইসব বঙ্গবাসীর একটি বিরাট অংশ বসবাস করতো। বঙ্গ ও সূহ্ম রাজ্যগুলির অন্তর্গত ছিল তৎকালের সুন্দরবন। এই প্রাচীন বঙ্গবাসীদের ঠিক কি নাম ছিল এখনও তা অজ্ঞাত হলেও অনেকে আর্যের বিপরীতার্থক শব্দ হিসাবে অনার্য শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু এরূপ শব্দ ব্যবহার কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিচার্য বিষয়, পতিত আর্য বা ভ্রষ্ঠ আর্য, দস্যু বা অসুর প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল। কারণ আর্য বা বৈদিক সাহিত্যে এই সব শব্দগুলির উল্লেখ আছে। যাহোক, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য খ্যাতনামা বাংলার ইতিহাস রচয়িতাগণ নিষাদ জাতিকে বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী বলে মনে করেন। নিষাদ জাতির পর দ্রাবিড় ভাষাভাষী আলপাইন জাতির লোক বাংলাদেশে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং এরাই বাঙালী জাতির আদি পুরুষ। এই প্রাচীন বাঙালী মোঙ্গলীয় গোষ্ঠী ভুক্ত ছিল না। সুতরাং হারবার্ট রীজলি সাহেবের সিদ্ধান্ত দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় রক্তের সংমিশ্রনে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে আজ সকলে একমত যে আর্যদের উপনিবেশ বিস্তারের ফলেই বাংলাদেশে আর্যভাষা, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। এবং বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অংশে পরিণত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই বাংলা শব্দটী মোঘল যুগেই দেশবাচক শব্দে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। মহামতি আকবরের সময়েই এই শব্দ বাংলা সুবা রূপে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।

কারণ প্রাক মুসলমান যুগে বর্ত্তমান বাংলা গৌড় রূপে পরিচিত ছিল। এখন তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যে মোঘল যুগে গৌড় ভূমি বাংলাদেশরূপে, এবং ইংরেজ শাসন কালে বাংলা দেশের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবনরূপে পরিচিত হয়েছিল। আর বাংলা ও সুন্দরবনের বর্ত্তমান সমাজ জীবন যথাক্রমে মোঘল ও ইংরেজ শাসন কালে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রাচীনযুগ থেকে আরম্ভ করে বার বার সীমারেখা পরিবর্তনের পর। যে ভৌগলিক সীমা বাংলা দেশকে চিহ্নিত করেছিল এবং সুন্দরবন প্রভৃতি খণ্ডাংশগুলি এই ভৌগলিক সীমার অন্তর্গত ছিল। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে নিম্নরূপ—"উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম, ও ভূটান রাজ্য, উত্তর পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত। পশ্চিমে রাজমহল সাওতাল পরগনা ছোটনাগপুর মালভূম ধলভূম কেওঞ্জর ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।" —"এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কার্যকরির উৎস এবং ধর্মকর্ম নর্মভূমি বাঙালর ইতিহাস। ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের সম্পুর্ণ ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বলেছেন—" একদা এদেশ গৌড়ভূমি বলে পরিচিত হয়েছিল। পরে মুসলমান যুগ থেকে এদেশের একাংশ বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ) নামনুসারে গোটাভূখণ্ডটাই বঙ্গ, বাঙ্গালা বঙ্গালা প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হল। পাশ্চাত্য বণিকেরাও এই বাংলাদেশকে ভূগোলে স্বীকার করে নিল। রাঢ় বরেন্দ্র বঙ্গ সবই আজ বঙ্গ-বাংলা নামের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। 'ডঃ কিরণ চৌধুরী মহাশয় তার— "ভারতবর্ষের ইতিহাস কথা" গ্রন্থে, বাংলাদেশের নামের পরিবর্তনের কথা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"পাল ও সেন যুগের পরবর্তীকালে। মোঘল সুলতানী আমলে বাংলাদেশ গৌড়

নামেই পরিচিত ছিল। মোঘল যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা নাম স্থায়িত্ব লাভ করে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাকে পাশ্চাত্য দেশীয় বণিকগণ কাগজ পত্রে বেঙ্গল (Bengala বা Bengalla) নামে অভিহিত করিয়াছে। ইংরাজ বণিকগণই সর্বপ্রথম বাংলাকে বেঙ্গল (Bengal) নামে অভিহিত করিতে শুরু করে। আর এই বঙ্গভূমিতে যারা বাস করে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা হলো বাঙালী। আমরা পূর্বে বলেছি যে সুন্দরবন ২৪ পরগণা জেলা তথা বাংলা দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলা দেশের উত্থান পতনের সঙ্গে সুন্দরবনের ভাগ্য জড়িত। প্রাচীন কালে বাংলাদেশ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং সুন্দরবন ঠিক সেই সময় বাংলার একটি খণ্ডাংশরূপে বাংলার সর্বদাক্ষিনাংশে অবস্থিত ছিল। তখন এর নাম ছিল শাক দ্বীপ। ঠিক বাংলাদেশের মত সুন্দরবনের ভৌগলিক সীমা ও নামের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আদি যুগে চিহ্নিত হলো ব্যাঘ্রতট মণ্ডল দেশরূপে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগে পরিচিত হলো ভাটির দেশ রূপে। আবার আধুনিক বৃটিশোত্তর যুগে অভিহিত হলো সুন্দরবন রূপে। এইভাবে বহু রূপান্তরের মাধ্যমে বহু ভৌগলিক সীমা পরিবর্তনের ফলে, পশ্চিম বঙ্গের মত বঙ্গের অঙ্গ ছেদনের পর বর্ত্তমান সুন্দরী হীন সুন্দরবন এক নূতন কলেবরে আত্ম-প্রকাশ করেছে। আমাদের এই সিদ্ধান্তের অনুকুলে প্রখ্যাত বাঙালীর ইতিহাস লেখক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাংলার নদনদী' গ্রন্থের কতিপয় পংক্তি উল্লেখযোগ্য মনে করি—"রালও ফিচ (Ralyon Fitch—1583-91) বলিতেছেন Bengala দেশ ব্যাঘ্র, বনমহিষ ও বন্য মুরগী (হাঁস) অধ্যুষিত বনময় জলাভূমি। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, দেবপালের নালন্দা লিপি, এবং লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া লিপিতে ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ আছে। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে (যে সমুদ্রতট ব্যাঘ্রদ্বারা অধ্যুষিত) মনে হয় ২৪ পরগণা, খুলনা, বাখর

গঞ্জের দিকেই যেন স্থানটির ইঙ্গিত।" এই উদ্ধৃতি থেকে এখন স্পষ্ট হয়েছে যে সুন্দরবনের আদি যুগের নাম ছিল ব্যাঘ্রতটিমণ্ডল। তার পরে ডঃ রায়ের ভাষায় "মধ্যযুগে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, লেখকেরা, ময়নামতী গানের রচয়িতা প্রভৃতি ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে সারা বাংলার পূর্বদিকে বেঙ্গল (Bengala—ঢাকায় বাঙ্গালী বাজার) পর্যন্ত ; বোধহয় চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত নিম্নঞ্চল পর্যন্ত বাটি বা ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবুল ফজল বাটি বা ভাটি বলিতে সুবা বাংলার পূর্বাঞ্চল বুঝিয়াছেন। মাধব চন্দ্র রাজাব গানেও "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গালী লম্বা লম্বা দাড়ি।" এই ভাটিরও ইঙ্গিত সমুদ্রগামী এই সব নিম্নভূমির দিকে অর্থাৎ বঙ্গভূমির দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে, —এই নিম্নভূমি যে বঙ্গভূমি সুন্দরবন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এ প্রসঙ্গে প্রণিত রায় চৌধুরী মহাশয়ের বঙ্গ সংস্কৃতি কথা পুস্তিকা থেকেও কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করলে ২৪ পরগণা এবং এই জেলার অন্তর্গত সুন্দরবন সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হতে পারে। তার ভাষায় "সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি চব্বিশ পরগণা জেলাটির পাদদেশে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে হুগলী নদী এছাড়া বিদ্যাধরী, ইছামতী, মাতলা, পিয়ালী প্রভৃতি অসংখ্য নদী জেলাটার বুক দিয়ে বয়ে গিয়ে দক্ষিণ বঙ্গোপ-সাগরে মিশেছে। নদীমাতৃক জেলাটির নদীর ভাঁটা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় বলে মধ্যযুগে এ অঞ্চলটাকে ভাটার দেশ বা ভাটি বলা হতো। হিন্দু বৌদ্ধ যুগে এই ভাটির নাম ছিল সমতট।" তারপর তিনি বলেছেন "পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহনা থেকে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণার দক্ষিণে অসংখ্য নদীবহুল আর্দ্র আরণ্যক অঞ্চল সুন্দরবন নামে খ্যাত।" আমরা এখন উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলির সমর্থনে সুন্দরবনের একটি ব্যাপক সীমা নির্দেশ করার চেষ্টা করতে পার। পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি যে ১৫টি থানা ও ১৯টি উন্নয়ন সংস্থা নিয়ে বর্তমান

সুন্দরবন। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থিত বর্ত্তমান সুন্দরবনই আমাদের আলোচ্য বিষয়। নদীমাতৃক সুন্দরবনকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। পশ্চিমে ভাগীরথীর পূণ্য সলিলবাহী হুগলী নদী, পূর্ব্বে দক্ষিণে আশীর্বাদ ধন্য ইছামতী ও বায়মঙ্গল নদী, দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে বহু সন্তান সন্ততিসহ বঙ্গোপসাগর। মতিলা, সপ্তমুখী, ও ঠাকুরান সুন্দরবনের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে থেকে আরম্ভ করে প্রবাহিত হয়েছে সুন্দরবনের শিরায় উপশিরায়। উত্তর প্রান্ত বেষ্ঠন করে রয়েছে করতী আর বিদ্যাধরী। দ্বীপময় সুন্দরবনকে আবার ঘিরে রয়েছে জাগ্রত প্রহরীর মত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। পশ্চিমে রয়েছ বিশ্ববিখ্যাত মহর্ষি কপিলের সাধনক্ষেত্র পুন্যতীর্থ সাগরদ্বীপ। উত্তরে রয়েছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্মিক সম্পদে পরিপূর্ণ জয়নগর। ক্যানিং আর হাড়োয়া হাসনাবাদ। পূর্বে রয়েছে বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হিঙলগঞ্জ, সন্দেশখালী বাসন্তী ও গোসাবা। দক্ষিণে রয়েছে সুরক্ষিত প্রাচীর সদৃশ নামখানা ও পাথর প্রতিমা, এইভাবে যে সমস্ত নদী ও দ্বীপমালা সমগ্র সুন্দরবনকে চারিদিকে বেষ্ঠন করে, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার উত্তরাংশ এবং বাংলাদেশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। তার বর্ণনা দিতে গেল বলতে হয়, পশ্চিমের সীমা প্রসারিত হয়েছে হুগলী নদীর বুড়ি গঙ্গার তীর পর্যন্ত। উত্তর পশ্চিমে বরাবর ছত্রাকারে অবস্থিত রয়েছে চন্দ্রনগর, চণ্ডীপুব, গড়বেড়িয়া, রাধাকান্তপুর, মথুরাপুর, জয়নগব, মজিলপুর, বহড়া, গোচারণ, ক্যানিং, তালদি, পিয়ালী সিংহপুর ও কুলগাছি; উত্তরে রয়েছে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রাধানগর, তালবেড়িয়া, চৌহাবী, গোপালপুর, জলসিরা ও টাকী। পূর্বে সত্রাকারে ছড়িয়ে আছে হাসনাবাদ, ইছামতী, হিঙ্গলগঞ্জ, কালীন্দি, সাহেবখালী, রায়মঙ্গল। দক্ষিণে সজারুর মত পুচ্ছ বিস্তার করে আছে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ফেনীল উপসাগর আর আছে শতাধিক বিষাক্ত জিহ্বা ও দন্ত বিশিষ্ঠ মাতলা, ঠাকুরান ও সপ্তমুখী নদী। তাছাড়া, আছে বিষাক্ত লবণাক্ত বারি বিধস্ত জিপ্লট, গোবর্দ্ধনপুর

ধবলাট প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ও জনহীন দ্বীপ। এই দ্বীপময় ভূখণ্ডে যারা বাস করে তারা সবাই বাঙালী।

॥ ৬ ॥

নানা জাতি, নানা আচরণ

এবার আমরা আলোচনা করবো এই নদীবহুল যোগাযোগ বিহীন খণ্ড বিক্ষিপ্ত দ্বীপগুলির আধিবাসীদের জীবন জীবিকার জন্য তাদের জাতিতত্ত্ব কতখানি দায়ী। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার আচরণ সত্বেও তাহাদের ভৌগলিক একত্ব কিভাবে সুন্দর-বনবাসীকে দিয়েছে এক জাতীয় ঐক্য। সমাজ ও সংস্কৃতির সংহতি, কিভাবে তাদের ভারতীয় তথা বঙ্গেয় (পশ্চিমবঙ্গের) নাগরিকত্বে কিভাবে দৃঢ় বিশ্বাসী করে তুলেছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অপসংস্কৃতির হাতিয়ার হতে বিমুক্ত করে রেখেছে! পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করেছি এই বনভূমিতে বাস করে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃষ্টান-ব্রাহ্ম-আদিবাসী ও নানা অনুন্নত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ। এখানে বলা অবান্তর কিছু হবে না যে আদিম যুগের বংশ বিস্তার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন মুখ্য বিষয় ছিল জনবলের জন্য, সুন্দরবনের আদিম-যুগেও শ্বাপদ সঙ্কুল বনভূমিতে জনবল বৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ঠিক তেমনি প্রধান কাম্য ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে এখানে জন্ম নিয়েছে বহু অবৈধ সন্তান। খাদ্য উৎপাদন ও সন্তান প্রজনন এই দুটি মৌল উপাদানই ছিল বাঙালী সমাজের চরম লক্ষ্য। বৈধ ও অবৈধ কোন প্রশ্ন তখন ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর। অবাধ অবৈধ সন্তান উৎপাদনের ফলে সুন্দরবনে সৃষ্টি হয়েছে বহু উপজাতি ও খণ্ডজাতি। বঙ্গদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বহু উপজাতি ও খণ্ডজাতি সমন্বিত এই সুন্দরবনের সমাজ মূলতঃ বাঙ্গালী সমাজ। নিরক্ষর সুন্দরবন

বাসীদের কিয়দাংশ মুসলমান ও বৃটিশ আমলে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও সুন্দরবনের সমাজ বহু বিবর্তনের মধ্যেও তার বাঙালীয়ানা বজায় রেখেছে। এটাই তার বৈশিষ্ট্য, এ সমাজ ভারতীয় হিন্দু সমাজ। এই প্রসঙ্গে 'বাঙালী জীবনে বিবাহ' গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন— "বাঙলার প্রাচীন জনপদ সমূহ, যাদের একাধিকরূপ আধুনিক বাংলা বা বিভিন্ন আদিবাসী কৌমের নামানুসারে সৃষ্ট। ভোস চণ্ডাল, বঙ্গ, করভট, পোদ (কৈবর্ত মাহিষ্য) বাগদী (বর্ম ক্ষত্রিয়) প্রভৃতি বাংলার আদি বাসিন্দা, মৌর্যযুগ অবধি বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য হেতু বাগদীদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। মহাবীর এবং বুদ্ধের আমল থেকেই বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ চলতে থাকে, কিন্তু গুপ্ত আমলের আগে তা ব্যাপ্তিলাভ করে না। গুপ্তযুগে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বাঙলায় অনেক ব্রাহ্মন আসেন,······ নবম দশম শতাব্দী নাগাদ বাংলার বহুজাতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন, কৈবর্ত সমাজ বিদ্রোহের সামিল হন এবং বৃত্তিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী বৈদ্য ও কায়স্থগণ জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পান। ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ।" তারপর তিনি ধর্ম পরিয়ে দিতে গিয়ে বলেছেন —"এখানে চাতুবর্ণ বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈদ্য অনুপস্থিত। তাই বলা হয়েছে যে কলিযুগে বাঙলা থেকে চারিটি বর্ণের মধ্যে দুটি বর্ণ বিদায় নেয় এবং প্রথম ও চতুর্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মন ও শূদ্র বর্ণের লোকদের নিয়েই বাঙালী হিন্দু সমাজ গড়ে ওঠে, এই সমাজে আছেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য,কায়স্থ, নমঃশূদ্র, বাগদী, পোদ, তেলি, মুচী, মাহিষ্য, করণ, গোপ, বণিক, সাহা, সুরি, কর্মকার, নাপিত, বারুই বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ধোপা, মুচি, জেলে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাছাড়া বাঙালীদের মধ্যে আছে প্রায় তেষট্টি রকম তপশীলি জাতি এবং ৪১ রকম উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক, আছে কুর্মী মাহাত, কোটি কোটি মুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টান। হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং

কায়স্থগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এত বেশী সংখ্যক কায়স্থ ভারতের অপর কোন রাজ্যে নাই। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বৈদ্য নামে আর একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় আছেন"। তারপর সেনগুপ্ত মহাশয়ের উপরোক্ত পুস্তক থেকে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যে একটু তথ্য পাওয়া যায় ত' এখানে আলোচনা করা দরকার। তাঁর ভাষায় "বাঙলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছেন রাঢ়ী, বারেন্দ্র সারস্বত, বৈদিক (পাশ্চাত্য ও দাক্ষিনাত্য) সাতশতী, গ্রহবিপ্র শাক দিঘী ও ব্যাস প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এদের মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র, শ্রেণীর ব্রাহ্মনেরাই সংখ্যাধিক। এই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মনেরা আদিস্থুর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর বলে ঐতিহ্য বিশ্বাসী ব্রাহ্মদের অভিমত।" পঞ্চ ব্রাহ্মনের আগমন কারণ সকলের অবিদিত যে পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে বৈদিক আচার আচরনাদি ব্রাহ্মনেরা বিস্মৃত হলে কান্যকুব্জ থেকে আদিস্থুর আচারবান ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। বাসোপতি মিশ্র ও অন্যান্য রাঢ়ীয় কুলাচার্যগনের মতে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম যথাক্রমে—ভট্টনারায়ণ (সাণ্ডিল্য গোত্র), দক্ষ (কাস্যপ গোত্র), ছান্দড় (বাৎস্য গোত্র) শ্রীহর্ষ (ভরদ্বাজ গোত্র) এবং ভেদগর্ভ (সাবর্ন গোত্র)। এ বিষয়ে বারেন্দ্র কুলার্যগনের মতভেদ আছে। যাহোক, এদেশে আসার সময় প্রত্যেকে এক একজন করে কায়স্থ ভৃত্য সঙ্গে আনেন, তারা কুলীন কায়স্থ নামে পরিচিত, 'এই পঞ্চ কায়স্থের নাম যথাক্রমে—মার্কণ্ড ঘোষ (সৌকালীন গোত্র), দশরথ বসু (গৌতম গোত্র) পুরুষোত্তম দত্ত (মোদগল্য গোত্র), বিরাট গুহ (কাস্যপ গোত্র) এবং কালিদাস মিত্র (বিশ্বামিত্র গোত্র)। ব্রাহ্মণ পঞ্চক ভৃত্যসহ যে যে গ্রামে বাস করেন তাঁদের নাম—কাসবী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, ‹কগ্রাম ও বট গ্রাম।'

"ব্রাহ্মণের পর বাংলার উচ্চবর্ণে বৈদ্যদের স্থান। এই ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাড়া বাংলার অপর উচ্চবর্ণীয় জাতি কায়স্থ সংখ্যালঘু হলেও উচ্চবর্ণের এই জাতিত্রয় অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃস্থা-

নীয়। বৈদ্য সাধারণ অর্থে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বেদজ্ঞ তিনি বৈদ্য নামে অভিহিত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণিত আছে, ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সহবাসে ৮ম শতকের কাছাকাছি এই বর্ণের উৎপত্তি। বৈদ্যদের সমাজ প্রধানত চারটি। পঞ্চকোট, রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, ও বারেন্দ্র। ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের পর বাংলার উচ্চবর্ণের বৃহত্তম সমাজ বলতে কায়স্থদের বুঝায়। যাহোক বাংলার বর্ণ-বিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ ম্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ট বৈদ্য এবং অন্যান্য শংকর বর্ণের সমস্ত শূদ্র পর্যায়ের। উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে নিম্নবর্ণীয় অন্ত্যজবর্ণের মিলন মিশ্রণ ও সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর বাঙালী হিন্দু সমাজ। — এই মন্তব্য করেছেন শঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়। কায়স্থ ও করণ একটি শংকর বর্ণ। কারণ এদের পিতা বৈশ্য মাতা শূদ্রানী বলে প্রতিষ্ঠিত। এই বর্ণগুলি ছাড়া আরও বহু শংকর বর্ণ বাংলায় বাস করে। সেনগুপ্ত মহাশয়ের মতে ২৪ পরগণা জেলায় বহিরাগত লোক সংখ্যা বেশী। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও ভারতের নানা দেশের লোক এখানে বাস করে, জন সংখ্যার ¼ মুসলমান, তারা সুন্নী, শেখ, অজলা ও জোলা। ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল অল্প। পোদ, মাহিষ্য, কৈবর্ত, বাগদী, গোপ, কাওরা, তিয়র, মুচি, নাপিত, বৈষ্ণব ও নমঃশূদ্র প্রধান, তাছাড়া বুনোদের একটি সম্প্রদায়ও এখানে দেখা যায়।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি সংক্ষেপে বাঙালীর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হলো তার একটি চিত্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে নিম্নরূপে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম খণ্ড দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পুলহ মুনির পুত্র বাৎস্য নাম তার,
শাণ্ডিল্য রুচির পুত্র অতি চমৎকার॥
সাবার্নি গৌতম পুত্র অতি সদাশয়,
কাশ্যপ নামেতে পুত্র কশ্যপের হয়॥
বৃহস্পতি পুত্র হয় ভরদ্বাজ গুণী,
পঞ্চ গোত্র প্রবর্তক এই পঞ্চ মুনি॥

এই গেল ব্রাহ্মণদের কথা, এরপরে ক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধে বলা হয়,

চন্দ্র সূর্য্য মনু হ'তে উৎপন্ন যাহারা,
ক্ষত্রিয় নামেতে খ্যাত হইল তাহারা,
এই তিনজন হ'তে জন্মে খ্যাতিমান,
ক্ষত্রিয় মাঝারে তারা সবার প্রধান ॥

এর পরে বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়,

ভিন্ন জাতি মিলনেতে সন্তান যে হয়,
বর্ণের সঙ্কর তারে সকলেই কয় ॥
তাম্বুলী মোদক গোপ বণিক নাপিত,
সদ্ শূদ্র নামে তারা হয় অভিহিত ॥
বৈশ্য হ'তে শূদ্রাগর্ভে জন্মিল যাহারা,
করণ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥
ব্রহ্ম ঔরসে জন্মে বৈশ্যাগর্ভে যারা,
অম্বষ্ঠ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥

* * *

শূদ্রের ঔরসে আর ব্রাহ্মনী গর্ভেতে,
জন্মিল অস্পৃশ্য জাতি চণ্ডাল নামেতে ॥

* * *

অশ্বিনী কুমার পুত্র ব্রাহ্মনী উদরে.
ভূমণ্ডলে সুবিখ্যাত বৈদ্যনাম ধরে ॥
বৈদ্যের সন্তান বহু গর্ভেতে শূদ্রার,
ব্যাধগ্রাহী সাপুড়িয়া বংশধর তার ॥

কৈবর্ত জাতির সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

কৈবর্ত জন্মিল পরে কোচস্ত্রী উদরে,
চণ্ডালের হাড্ডি ডোম জন্মে তার পরে ॥

* * *

রাজপুত্র পৌণ্ড্রক ও আগুরী ধীবর,
রজক কোয়ালি, ব্যাধ, সর্ব্বসী কুদর ॥
বাগতীত, ম্লেচ্ছ, জোলা, শরাফ সকলে,
বর্ণের শংকর বাণী খ্যাত ধরাতলে ॥

*   *   *

সূতের ঔরসে আর শূদ্রানী উদরে,
যে জাতি জন্মিল তারা ভাট নাম ধরে ॥
এইরূপে নানাজাতি জনম লভিল,
ক্রমে ক্রমে ধরাতল ভরিয়া উঠিল ॥

মহাভারতে অনুশাসন পর্বে বর্ণ সংকর তত্ত্বের পূর্ণ সমর্থন ও আলোচনা আছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে যে আলোচনা হলো তার থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ভেদে আর্য ও অনার্য। গুণ কর্ম ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রচার বর্ণে মানবজাতিকে বিভক্ত কবা হয়। কিন্তু যুগ পরিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত বিভাগ-গুলি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে বহু বর্ণসংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এরাই আজ সারা বাংলা তথা সারা সুন্দরবনে ছড়িয়ে আছে। আমরা জাতিতত্ত্ব খুব সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। কারণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সুন্দরবনে যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ বাস করে তাদেব সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা। ধর্মীয় শাস্ত্রাদিতে যে জাতিতত্ত্ব দেওয়া হয়েছে তা কিছুটা কাল্পনিক। তাই পাশ্চাত্য দেশে কোষ বিজ্ঞান, প্রজননবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধান এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তাই আমাদের এই দিক দিয়ে কিছুটা আলোচনা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই নৃবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

নৃবিজ্ঞানীগণ মানবজাতির মধ্যে নানা গোষ্ঠীগত বিশেষত্ব আবিষ্কার করেছেন। তাদের মতে বর্তমানে ভারতে ছয়টি মানব-গোষ্ঠীর লোক বাস করে। যেমন—নিগ্রো, অস্ট্রালয়েড, মোংগল,

দ্রাবিড় আলপাইন ও নার্ডিক। ডঃ বি, এস, গুহের মতে ছয়টি গোষ্ঠি নিম্নরূপ - -

নিগ্রেটো, প্রোটোঅস্ট্রালয়েড, মঙ্গল্যায়েড, মেডিটারোনিয়ান, ব্রাকসিক্যালস ও নার্ডিক, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের অধিবাসীগণ ব্র্যাকিসিক্যাল নরগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। শঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের ভাষায় "দ্রাবিড় ও কোলগোষ্ঠির মানুষেরাই বোধ হয় বাঙালীর আদিম স্তর।

দীর্ঘ করোটি ও মধ্যমনাসা বিশিষ্ট দ্রাবিড গোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালীর যত মিল ভাষার ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে তত পার্থক্য। কোল ব্য অস্ট্রিকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা-উপভাষা সমূহ কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি বাংলার আদিবাসী উপজাতি ও খণ্ডজাতি সমূহের মধ্যে বিদ্যমান।" সুতরাং কিভাবে এই বাঙালী জাতির উদ্ভব হলো তা এখনও রহস্যাবৃত। তবে বাঙালী যে অনার্য জাতি নয় তার বহু প্রমাণ ঋগ্বেদের আরণ্যকের উল্লেখ থেকে বুঝা যায়। তারা খর্বাকৃতি এবং ভুরাহারী হলেও সুসভ্য ছিল, কারণ আর্যরা যখন মোম বা তেলের ব্যবহার জানতো না তখন বঙ্গবাসীরা রাত্রে প্রদীপ ব্যবহার করতো।

> "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রেব অতীয় মারং স্তানি মানিবয়াংসি বঙ্গা
> মগধাশ্চোপাদানানং অর্কমভিতো বিধিস্র।"

আরণ্যকের এই কয়টি পংক্তি বাঙালীর প্রাচীনত্ব ও প্রাকার্থ উন্নত সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার সাক্ষ্যবহন করে। মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণে ও বাঙালীর শৌর্য বীর্য ও ঐশ্বর্যের উল্লেখ আছে। যথা—

> বাঙ্গাল মগধা মৎস্যাঃ কাশী কোশলাঃ।
> তত্রজাতা বহুদ্রব্যং ধনধান্য অজানিষক্॥

ব্যাসদেব রচিত মহাভারতেও বঙ্গবাসীর সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মাতে সুতাঃ
তেষাং দেশাং সমখ্যাতাঃ স্বনাম প্রথিত ভুবি।

মহাভারতের যুগে যে বৃহদাঙ্গের কথা বর্ণিত আছে। তাতে জানা যায় তৎকালে বঙ্গে একজাতি ও এক বর্ণভুক্ত এক বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয় জাতি ছিল। তারা সমুদ্রযাত্রা ও নৌবাণিজ্য কৃষি ও শিল্প প্রভৃতিতে সমৃদ্ধিশালী ও সর্ব শাস্ত্রবিশারদ হিসাবে উত্তর ভারতের রাজগণের হিংসার পাত্র হয়ে উঠেছিল। এই সুসমৃদ্ধ জনপদ সম্বন্ধে শক্তিমঙ্গল তন্ত্রে নিম্নরূপে লিখিত আছে।

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তাগং শিবে।
গৌড়দেশ সমাখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

বঙ্গবাসী ও বঙ্গাধিপতি যে ক্ষত্রিয় জাতি ছিল তার আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় আগতরাজন্যবর্গের পরিচয়-দানের মধ্যে। এই সভায় তাম্রলিপ্ত রাজকুমার তাম্রধ্বজ পাণিপ্রার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

কলিঙ্গ তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধি প'তিস্তথা।
মদ্ররাজ স্তথা শল্যঃ সহ পুত্র মহাদ্বথঃ॥

* * *

এতে চান্যে চ বহবো নানা জনপদেশ্বরাঃ
তদর্থমাগতাঃ ক্ষত্রিয়ঃ প্রথিতো ভুবি॥

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি এই বঙ্গের কথা মহাভারতে বহুবার উল্লিখিত আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বঙ্গাধিপতি সসম্মানে ও সমাদরে—উপস্থিত ছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে।

বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ শাককাকনিবাসিনঃ॥

এই ভাবে জানা যায় যে মহাভারতীয় যুগের রাজবংশ বহুকাল পর্যন্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র তাম্রলিপ্ত ও গৌড়ে রাজত্ব করেন।

৭ম শতাব্দীতে বৈদেশিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় মহাভারতীয় যুগের রাজবংশধরগণই বঙ্গদেশে বসবাস করতো। বীরত্বজনক পদবীগুলির ক্রমবিবর্তনের ধারা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বঙ্গ তথা বঙ্গাংশ সুন্দরবনের জনগণের পদবীগুলি আলোচনা করলে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এখন সুন্দরবনের অধিবাসী পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদবী মেদিনীপুর, হাওড়া জেলার মত জানা, মান্না, মাইতি, বিশুই, দাস প্রভৃতি। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করবো। এখন দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। 'জানা' পদবী এসেছে প্রাচীন জনপতি শব্দ থেকে। সমাজের বা রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন ভাগ ছিল গ্রাম, গ্রামের পর বিশ এবং বিশের পর জনপদ। জনপদের শাসকদের বলা হতো জনপতি। বিশের ছিল বিশপতি। বিশপতি থেকে হয়েছে বিশুই, মহারাণা থেকে মান্না, মহোত্তর থেকে মাইতি, সুতরাং পদবী-গুলি ধরে ক্ষত্রিয় জাতিকেই বুঝাচ্ছে। যাহোক, পূর্বে উল্লেখ করেছি যে গুপ্ত যুগে ভূমিকম্পের ফলে গঙ্গার মোহনাস্থিত শাকদ্বীপটা ধ্বংস হয়ে যায়, তার স্থলে হাওড়া, হুগলী ও বরিশাল জেলা সৃষ্টি হয়। গুপ্তবংশের পতনের পর পালবংশের শাসন আরম্ভ হয়, তারপর আরম্ভ হয় সেন রাজত্ব। এই সেন রাজত্বের সময় জাতিভেদ বা বর্ণকৌলিন্য প্রকট আকার ধারণ করে, এই সময় পৌণ্ড্রগণ মনু কর্তৃক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সংস্কারহীন দাস জাতিতে পরিণত হয়। এদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ ব্যক্তি গৌড়বঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে চন্দ্রদ্বীপ চন্দ্রবন বা সুন্দরবনের জঙ্গল সাফাই করে বসবাস করে। তাই সুন্দরবনে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা খুব বেশী, সুন্দরবনে তপশীল সম্প্রদায়ের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জন্য মথুরাপুর, কাস্থপী প্রভৃতি বিধানসভা কেন্দ্রগুলি এখনও সংরক্ষিত আসনরূপে পরিগণিত। এইসব অঞ্চলে মেদিনীপুর হাওড়া জেলার বেশীর ভাগ লোক বাস করে, এরা মাহিষ্য ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত, পুণ্ড থেকে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আর সূক্ষ্ম তাম্রলিপ্ত অবস্থা থেকে মাহিষ্য ক্ষত্রিয়গণই সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। এখানে

বলা নিষ্প্রয়োজন যে সেন রাজত্বকালের পূর্বে বঙ্গদেশে কোন জাতিভেদ বা জাতি বিভাগ ছিল না, সমগ্র ব্রহ্মের পূর্ব থেকে সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ একবর্ণভুক্ত গঙ্গারাঢ়ী মাহিষ্যগণ বাস করতো, বঙ্গে যারা মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বঙ্গের বাহিরে তারা রাজপুত জাতিরূপে পরিচিত। পাল রাজাগণ সকলেই মাহিষ্য ক্ষত্রিয় ছিলেন, এরা বৈদিক আর্য রীতিনীতি অমান্য করার জন্য সমগ্র বৈদিক আর্য শাস্ত্রগুলি এদের দাস নামে অভিহিত করেছে, যথা—

ততঃ পরেন ভূপালা গোপালা দাস জীবিনঃ।
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো দ্বিজাতিকৃপণা জনাঃ॥

মঞ্জুশ্রী মূলকণ্ঠা—৮৮৩

কিন্তু পরাশর সংহিতা ও বৃহদ্ধর্ম সংহিতায় বলা হয়েছে এই দাস জাতি অচ্ছ্যুৎ জল অচল ভৃত্য শ্রেণীর শূদ্র নয়। এদের স্থান ছিল ব্রাহ্মণের নিম্নে। এই দাস জাতি লাট ও কর্ক দ্বীপ নদীয়া ও যশোহরে বাস করতো। সেন যুগীয় এড়ু মিশ্রের কারিকায় তাই উল্লেখ আছে—যোগিশ্র ধীবর প্রাপ্তো লাট কঞ্চ দানস্য রাজ্যকম্” দাস অর্থে শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সেবক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কৃষ্ণ ভক্তগণ গৌরবার্থে দাস পদবী গ্রহণ করতেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব, বৈশ্যাঃ শূদ্রা নীচাশ্রয়াঃ
দাসা ভবন্তি, দেবর্ষে যদর্থে কৃষ্ণসেবিনঃ॥

॥ ৭ ॥

মন্তব্য

এখন আমরা সারসংক্ষেপে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বাংলার আদিবাসীদের জাতি ও সমাজ জীবন এখনও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তবে ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা লব্ধ তথ্যাদি থেকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে প্রাক-আর্যযুগের বঙ্গ-বাসীগণ একেবারে বন্য অসভ্য জাতি ছিল না। কোন এক প্রাচীনতম সভ্য জাতির বাসভূমি ছিল এই বঙ্গদেশ। পরবর্তীকালে ভিন্ন গোত্রীয় অবৈদিক এক আর্যজাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারাই বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। যার থেকে ঐতিহাসিক যুগের রাজ সংস্কৃতির সুরম্যপ্রসাদ নির্মিত হয়েছিল। সুদীর্ঘ পাল বংশের রাজত্বকাল সুরু হয়েছিল বাঙালীর নবজাগরণ। বৌদ্ধধর্মের প্রতিকুলে সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যে বর্তমান বাঙালী সমাজের হয়েছিল গোড়াপত্তন। কারণ ব্রাহ্মণ্যের আর্য আদর্শ সর্ব্বজনীন সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহারে রূপান্তরিত হতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল। এই ব্রাহ্মণ্য শাসন বা অনুশাসনই বাঙালীর নূতন সমাজ বন্ধনের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করেছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে নব সমাজ বিন্যাসে বঙ্গভূমিতে কখনও চাতুর্বর্ণের আভিজাত্যভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। বৃত্তিভেদমূলক সমাজবিন্যাস বাংলা দেশের বিশেষ কৃতিত্ব। শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কর্ম ভিত্তিক বর্ণ বিন্যাস এবং শ্রীচৈতন্যের উদার জাতি বর্ণ হীন বৈষ্ণব ধর্মমত উপরোক্ত সমাজ বিন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও প্রসারিত করেছিল। শ্রীমোহিত লাল মজুমদারের ভাষায় 'বাংলার নানা জাতি নানা শ্রেণীতে অখণ্ডিত সমাজকে হিন্দুত্বের আচরণ দিবার উদ্দেশ্যে বাংলার তিন ব্রাহ্মণ তিন দিক থেকে তিন

রকম চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা, দ্বিতীয়—দেবীবর, জাতিকুল নির্ণয় ও বৈবাহিক ও আদান প্রদানের দ্বারা, তৃতীয়—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন আচার ধর্মের প্রবর্তন দ্বারা। "প্রথম দুইজন social cohesion বা সামাজিক ও জাতিগত সংহতি শক্তির উন্মেষ সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। রঘুনন্দন আকারগত, ব্যবহারগত, আচারগত, আদর্শের সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত ছিলেন।" তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন—'আগম বাগীশ কৃষ্ণানন্দ ও শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ গিরি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য উন্মেষের আর দুইজন সাধক। কারণ এরা বাঙ্গালাদেশে শৈব বিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা জাতিভেদ শিথিল করেছিলেন। ইহা ঠিক বৈষ্ণব সহজিয়ার কণ্ঠিবদল প্রথার মত ছিল। 'ভাবার মেয়ে বিবাহও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সুন্দরবনের সমাজ জীবন বাঙালী সমাজ জীবনের এক বিশেষ প্রতিচ্ছবি। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে কিছুটা বিকৃত।

আমাদের মন্তব্যের সমর্থনে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে কতপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, তিনি বলেছেন—"মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সম্প্রতি প্রাক্ আর্য যুগে বাঙালীর উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পশ্চমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বর্ধমান জেলায় অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে অনেক স্থানে ভূগর্ভ উৎখননের ফলে বাংলার খুব প্রাচীন এক সভ্যতার বহু মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৯৬২ ও ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অজয় নদের দক্ষিণে "পাণ্ডু রাজার ঢিবি" তে খুব ব্যাপকভাবে এবং নিকটবর্তী আরও কয়েকটি স্থানে সামান্য ভাবে মাটি খনন করিয়া যে সকল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও নানাবিধ,

দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায়, মধ্যভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল। বাংলাদেশের এই (সম্ভবত অন্য) অঞ্চলেও সেইরূপ সভ্যতাসম্পন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করিত। "ইহারা ধান্য চাষ করিত। নানারকমের এবং নানা নক্সার চিত্রশোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত। সম্বর, নীলগাই প্রভৃতি পশু শিকার ও শূকর প্রভৃতি পশুপালন করিত। এখানকার সর্বপ্রাচীন অধিবাসীরা প্রস্তর ও তাম্রধাতু ব্যবহার করিত এবং ক্রমে লৌহের সহিতও পরিচিত হইয়াছিল।"

শুধু এই স্থানে নয় বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র এই জাতির পরিচয় আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তৎকালে সুন্দরবন অঞ্চলেও এই সুসভ্য জাতির বাস ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। অজয় নদের নিকটবর্তী স্থান ছাড়াও কোপাইকুনুর নদীর তীরস্থ নানা স্থানে এমনকি কালনা কাটোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে উপরোক্ত সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। তাই ডঃ মজুমদার বলেছেন "পাণ্ডু রাজার ঢিবি বোলপুরের দক্ষিণে, ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কলিকাতার দিক হইতে রেলওয়ে স্টেশন ভেদিয়া ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ও দক্ষিণে কোপাই হইতে কুনুর নদীর তীর এবং পশ্চিমে দুবরাজপুর হইতে পূর্বে কাটোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নানা স্থানেও এই প্রকারে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

পরে বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, 'প্রাচীন বাঙালী জাতি আর্যবংশসম্ভূত নহেন। ঋগ্বেদ সংহিতার সময়ে আর্য জাতি যমুনা বা গঙ্গা নদীর পূর্বে আসেন নাই। তাঁর সিদ্ধান্ত—শত পথ

ব্রাহ্মণের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে—বৈদিক যুগের শেষ ভাগে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়। মহাভারত ও পুরাণের যুগে বাংলাদেশে আর্য জাতির বিশিষ্ট প্রভাব সূচিত হয়। মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীকে তিনি ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করেন না, তবে মহাভারতে বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী লোকদিগকে ম্লেচ্ছ ও ভারতপুরাণে কিরাত, যবন, খস এবং সূহ্মগণকে পাপাশয় বলে যে বর্ণনা আছে তার সত্যতায় বিশ্বাস করেন। কারণ তিনি বলেছেন যে 'অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও উন্নত সভ্য অধিবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আদিম অসভ্য জাতিও বাস করিত।' এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলে উপরোক্ত শ্রেণীর লোক বাস করতো। বাংলা দেশের সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের সমাজ সভ্যতার পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্গ সমাজও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারা ডঃ মজুমদারের মতে নিম্নরূপ।—

"আর্যগণের উপনিবেশের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলা দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। পাচীন অনার্যভাষা লুপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হইল। বর্ণাশ্রমেয় নিয়ম অনুসারে সমাজ গঠনও হইল। এক কথায় সভ্যতার দিক দিয়া বাংলা দেশ আর্যাবর্তের অংশরূপে পরিণত হইল।" এর পরে তিনি বিশ্ব ইতিহাসে পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে বলেছেন—"পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, যখন কোন প্রবল উন্নত সভ্য জাতি ও দুর্বল অনুন্নত জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখনই শেষোক্ত জাতি নিজের সত্তা হারাইয়া একেবারে প্রথমোক্ত জাতির মধ্যে মিশিয়া যায়। তবে পুরাতন ভাষা, ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হয় না। নূতনের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা দেশেও এই নীতির অন্যথা হয় নাই। বাংলার প্রাচীন অনার্য জাতি সর্বপ্রকারে আর্য

সমাজে মিশিয়া গিয়াছে।"

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে উন্নত ও অনুন্নত জাতির সংমিশ্রণের ফলে কি শেষোক্ত জাতির সমস্ত নিজস্ব কৃষ্টি বা বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যায়? উত্তরে বলা যায় সম্পূর্ণ অবলুপ্তি সম্ভব নয়। যদি তাই হতো তাহলে মুসলমান বা ইংরেজদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে বাঙালী বা হিন্দুজাতি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যেতো কিন্তু তা হয় নি; আর্য অনার্য শক হুন দল, পাঠান মোগল যৌথভাবে টিকে আছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য—

"বাঙালীর 'খোকাখুকু' ডাক, বাঙালী মেয়ের শাড়ি সিন্দুর ও পান হলুদ ব্যবহার; বাঙালীর কালী মনসা পূজা ও শিবের গাজন, বাংলার ধালাম চাটল প্রভৃতি আজও অনার্য যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। ঠিক কোনসময়ে আর্য প্রভাব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দে বা তাহার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার প্রভৃতি উপলক্ষে ক্রমশ বহু সংখ্যক আর্য এদেশে আগমন ও বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। গুপ্ত সম্রাটগণ এদেশে রাজ্য স্থাপন করার ফলে যে আর্য প্রভাব বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" আবিস্কৃত তাম্রশাসন ও শিলালিপি গুলিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলার গ্রাম ও নগরের নাম বা পদবীগুলি থেকে আর্য প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন, চণ্ড, বর্মন, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি পদবী বা পুণ্ড্র বর্ধন, পঙ্ক নগরী, চণ্ড গ্রাম প্রভৃতি গ্রাম। তাঁর মতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য সভ্যতা বাঙালীর সমাজে সব শেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এখানে 'সমাজের কথা' প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার মহাশয় আদিম বাঙালী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করলে সুন্দরবনের সমাজ সম্বন্ধেও আমরা অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারবো। তিনি বলেছেন—"বাংলার আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশই শূদ্র জাতিভুক্ত

হইয়াছিল। মনু সংহিতায় উক্ত জাতি হইতেছে, পুণ্ড্রক ও কিরাত এই দুই ক্ষত্রিয় জাতি। ব্রাহ্মণের সহিত এদের সংস্রব না থাকায় এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মাদির অনুষ্ঠান না করায় এরা শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। কৈবর্ত জাতি মনু সংহিতায় সঙ্কর জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু পুরানে অব্রাহ্মণ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এইরূপে আরও অনেক জাতির বিপর্যয় ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলা দেশের জাতি বিভাগ বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।'

কলিকালে বঙ্গদেশে শুধু ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ থাকবে না এই প্রচলিত অভিমত তিনি সমর্থন করেন না। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ এই দুইখানি গ্রন্থকে তিনি মিশ্রজাতির ইতিহাসের প্রামান্য গ্রন্থ বলে মনে করেন। এই গ্রন্থদ্বয় হিন্দুযুগের শেষ ভাগে বা তার অব্যাহিত পরে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে রচিত বলে মনে করেন। পূর্বে এই গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেছি এবং সাহায্য নিয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ৩৬টী (প্রকৃত পক্ষে ৪১) জাতির বর্ণনা আছে। রাজা বেন বর্ণাশ্রম ধর্ম নষ্ট করার জন্য বলপূর্বক বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর সংযোগ সাধন করেন, ফলে বহু মিশ্র বর্ণের উদ্ভব হয়। এই মিশ্রবর্ণ গুলি সবই শূদ্র জাতীয় এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন ছিল সঙ্কর শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

উত্তম সঙ্কর ২০টি—করণ, অম্বষ্ঠ উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গন্ধ বণিক, নাপিত, গোপ (লেখক), কর্মকার, তৌলিক (সুপারী ব্যবসায়ী) কুম্ভকার, কর্মকার, শঙ্খিক, দাস (কৃষিজীবি), বারুজীবি, মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত্র ও তাম্বুলী।

মধ্যম সঙ্কর পদবী—তক্ষন, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক।

অধম সঙ্কর নটি—মলেগ্রাহি, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী ও মল্ল।

এই তিনটি শ্রেণীর সঙ্কর জাতি কিভাবে নির্নীত হয় তারও বর্ণনা আছে। উল্লিখিত গ্রন্থে বলা হয়েছে—'যাদের পিতামাতা উভয়ই চতুর্বর্ণ ভুক্ত উত্তম সঙ্কর তারা। যাদের মাতা চতুর্বর্ণভুক্ত অথচ পিতা উত্তম সঙ্কর তারা মধ্যম সঙ্কর, আর যাদের পিতামাতা উভয়েই সঙ্কর তারা অধম সঙ্কর। ডঃ মজুমদারের মতানুসারে উল্লিখিত উত্তম ও মধ্যম সঙ্করভুক্ত বর্ণের অধিকাংশই এখনও বাংলায় সুপরিচিত জাতি। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে করণ ও অম্বষ্ঠ সঙ্কর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই করণই পরে কায়স্থ জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে এখনও ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্য ও কায়স্থ নিজেদের উচ্চ জাতি বলে মনে করে। এই জাত্যাভিমান এখন সম্পূর্ণ নিরর্থক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও মিশ্র-বর্ণের বিরাট তালিকা আছে। পূর্বে কিছুটা উল্লেখ করেছি। কিছু কিছু প্রভেদ সত্ত্বেও বৃহদ্ধর্ম পুরাণের সহিত এই পুরাণের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অধিকাংশ উত্তম ও মধ্যম সঙ্কর জাতিই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সৎশূদ্র বলে বর্ণিত হয়েছে। ইহা ছাড়া বৃহদ্ধর্ম পুরাণের ন্যায় এই পুরাণেও নানাবিধ ম্লেচ্ছজাতির উল্লেখ আছে। যাহোক্, এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে যে সব জাতির কথা আছে তার প্রায় সবই বর্তমানে আছে। স্থান কাল ভেদে সমাজে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব, উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য সুন্দরবন অঞ্চলের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। তবে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল হিসাবে এইসব অঞ্চলে নিম্ন জাতির প্রাধান্য ছিল এবং এখনও আছে। "নৈহাটিতে তাম্রশাসনে পুলিন্দ নামে আর এক শ্রেণীর আদিম জাতির উল্লেখ আছে। তাহারা বনে বাস করিত; শবর জাতির কথা সর্ব প্রাচীন বাংলার অন্য গ্রন্থেও আছে। বাংলা দেশে সর্ব প্রাচীন কালে যে সকল জাতি বাস করিত, সম্ভবত ইহারা তাহাদেরই বংশধর এবং সহাস্রাধিক বৎসরেও ইহাদের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই,"—বাংলা দেশের ইতিহাস ডঃ মজুমদার। সুন্দরবনের সমাজ জীবনের কথা আলোচনা

করতে গিয়ে আমরা বর্ণবিন্যাসের কথা আলোচনা এতক্ষণ করেছি। তার প্রধান কারণ ডঃ নীহাররঞ্জনের ভাষায়—"বর্ণ বিন্যাস ভারতীয় সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি।……যে যুগে বাংলাদেশের ইতিহাসেয় সূচনা সে যুগে বর্ণাশ্রম আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। এবং ধীরে ধীরে তাহা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতেছে,…বর্ণাশ্রমই আর্য সমাজের ভিত্তি। শুধু ব্রাহ্মণ সমাজেরই নয়, জৈন ও বৌদ্ধ সমাজেরও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর্যপূর্ব ও অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এই বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং আদর্শের মধ্যেই সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার সমাজ বিন্যাসের কথা বলিতে গিয়া সেইজন্য বর্ণ-বিন্যাসের কথা বলতেই হয়।"

ডঃ রায়ের মতানুযায়ী বাংলার বর্ণবিন্যাসের প্রথম পর্বের ইতিহাস পাওয়া যায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুবোধায়ণ প্রভৃতি স্মৃতি ও সূত্রকারদের গ্রন্থ থেকে। বৌদ্ধ ও জৈন প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকেও বহু তথ্য পাওয়া যায়। বাংলার বর্ণবিন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় গুপ্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, 'রামচরিতের' কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলার শেষ পর্বের বর্ণ বিন্যাসের চিত্র পাওয়া যায়—দু'টি অর্বাচীন পুরাণ গ্রন্থ বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বল্লাল রচিত এবং কুলজী গ্রন্থমালা থেকে। অসংখ্য শিলালিপি থেকেও বহু তথ্য পাওয়া যায়, এইসব ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদি ছাড়া আর একটি উপাদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তার নাম চর্যাচর্যবিনিময় বা চর্যাগীতি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ পর্যায়ের বর্ণ-সংবাদ চর্যাগীতি থেকে পাওয়া যায়।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' থেকে আরও জানা যায় যে, আর্যীকরণের সূত্রকার আগে এই দেশ অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, ভারতীয় বর্ণ বিন্যাস আর্য-পূর্ব ও আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। বাংলাদেশ

উত্তর ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ, আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব এদেশকে আক্রমণ করেছে সকলের পরে। বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রত্যন্ত অঞ্চল সুন্দরবন সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে বলা যায় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরও পরে সুন্দরবনে এসেছে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙালীর উৎপত্তি' নামক সাতটি পরিচ্ছেদযুক্ত একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সপ্তম পরিচ্ছেদের স্থূল কথায় তিনি বাঙালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপসংহার করেছিলেন তার আলোচনা এখানে খুবই প্রয়োজন মনে করি। কারণ পূর্বে আমরা যে সব কথা সুন্দরবনবাসীর উৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি তার অনেক সমর্থন যোগ্য মন্তব্য এতে পাওয়া যাবে। তিনি প্রধানতঃ ভাষা ও আকারগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই জাতির উৎপত্তি নির্দ্ধারন করার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—"ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান জাতি সকল এক প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন যাহার ভাষা আর্য্যভাষা। সেই আর্য্যবংশীয় বাঙালীর ভাষা আর্য্যভাষা, এজন্য বাঙালী আর্য্যবংশীয় জাতি। তবে বাঙালীরা কি প্রকার আর্য—তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন "প্রথম কোল বংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য। এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে"। এর পরে তিনি একটি অতি সুন্দর তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা বাঙালীর উৎপত্তি এবং ইংরেজী প্রভৃতি অন্যান্য জাতির উৎপত্তির পার্থক্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়—"সাক্সন, ডেন্‌ও নর্ম্মান মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে, কিন্তু ইংরেজের গঠনেও বাঙালীর গঠনে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। টিউটন হউক বা নর্ম্মান হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি গঠিত হইয়াছে, সকল গুলিই আর্য বংশীয়। বাঙালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে তাহারা কেহ আর্য,

কেহ অনার্য্য, দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে টিউটন ওর্ডেন ও নর্ম্মান এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়াছে। বাছিয়া তিনটি পৃথক করিবার উপায় নাই।······কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের বর্ণধর্ম্মহ হেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই। আর্যসম্ভূত ব্রাহ্মণ অনার্যসম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছেন।····· ইংরেজ এক জাতি, বাঙালীরা বহু জাতি। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙালী বলি তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য তৃতীয় আর্য্যনার্য হিন্দু আর তিনের পর এক চতুর্থ জাতি বাঙালী মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙালী মুসলমান, উপরের স্তরে প্রায় সকলেই আর্য্য।"

এই উদ্ধৃতির শেষাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে আছে অনার্য। সুতরাং সুন্দরবনাঞ্চলে যে অনার্য্য জাতীয় বাঙালীর সংখ্যাধিক্য থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এর প্রমাণ হিসাবে বঙ্কিমের উপরোক্ত প্রবন্ধ থেকে আরও কিয়দাংশ উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন—"আর্য্যেরা বাংলায় আসিবার পূর্বে বাংলায় অনার্য্যদিগের বাস ছিল।···সেই অনার্যগণ এক বংশীয় নহে। কতকগুলি কোল বংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড় বংশীয়। দ্রাবিড় বংশের পূর্বে কোল বংশীয়েরা বাংলার অধিকারী ছিল। তারপর দ্রাবিড় বংশীয়েরা আসিয়াছে, পরে আর্য্যগণ আসিয়া বাঙলা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনার্য্যগণ তাঁহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং বন্যভূমি সুন্দরবনে যে অনার্য্য জাতির বাস ছিল এবং বহু পূর্ব থেকেই ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনানুসারে

প্লবনীয় ভূমি (প্লাবিতর শব্দ থেকে অনুমেয়) সুন্দরবনে পৌণ্ড্রাই বাস করতো। কারণ শতপথে উল্লেখ আছে—"ত এতে অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মূর্তিবাঃ ইতি উদন্তাঃ বহবো ভবন্তি।" মহাভারতের সভাপর্বেও এর উল্লেখ আছে মনু সংহিতায় পৌণ্ড্রদিগকে ভ্রষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে, আচারভ্রংশ বলে এরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। বর্ণনা নিম্নরূপ দেখা যায়—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ,
পারদা পহ্লবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এরা ম্লেচ্ছ অথবা অনার্য্য। পৌণ্ড্র থেকে পুণ্ড্র পরে পুণ্ড এবং পুণ্ড স্থলে পুড় বা পুঁড়ো অথবা ঈকার যোগে পুণ্ডর থেকে পুণ্ডরীতে পরিণত হইয়াছে। এরা সকলে অনার্য, "পুণ্ডেরা এবং পুঁড়োবা যদি অনার্য্য, তবে পুণ্ডরীরা ও অনার্য্যজাতি। পোদ শব্দ পুণ্ড্র শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং পুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্মিয়াছে। ইহা আমার বিশ্বাস হয়।......পুঁড়ো, পুণ্ডরী এব পোদ। তিনটি এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুণ্ড্র জাতিব সন্তান। পুণ্ডেরা অনার্য্য জাতি ছিল।" বঙ্কিমচন্দ্রের—বিবিধ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আমরা পূর্বে বলেছি যে—সুন্দরবনের সমাজ পৌণ্ড্র সমাজ অথবা পৌণ্ড্র প্রাধান্য সমাজ; পৌণ্ড্রদের সম্বন্ধে তাই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো। সুন্দরবনের আরও কতকগুলি অনার্য জাতির বাস আছে। তাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। সুন্দরবনের বাগদীর সংখ্যা প্রচুর; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—"বাস্তবিক বাগ্‌দী দিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্য্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না, অনেকে বাগ্‌দী ও বাউরী এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন।"

এখানে মনে রাখা দরকার যে, অনার্য দুই প্রকার—দ্রাবিড় বংশীয়

অনার্য এবং কোল বংশীয় অনার্য। এই বিভাগ ভাষা ভিত্তিক। ঠিক এইরূপে আর্যও দুই প্রকার—ককেশীয় ও মোঙ্গলীয়। এই বিভাগ অবশ্য আকারগত। ককেশীয়দের গৌরবর্ণ, দীর্ঘশরীর, মস্তক সুগঠন ও হনূদ্বয় অনুন্নত। মোঙ্গলীয়েরা খর্ব্বাকার, মস্তকের গঠন চতুষ্কোন, হনূদ্বয় অনুন্নত। অনার্যরা দাস বা দস্যু নামে ঋগ্বেদ সংহিতায় অভিহিত, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫১ সূক্ত থেকে জানা যায়—দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ, বহিষ্মান (যজ্ঞ বিমুখ), অব্রব ও অদের পরন্তু মৃধ্রবাচ (কথা বলতে জানে না)। মহাভারতের সভা পর্ব্বেও অনার্যদের বর্ণনা আছে, যথা—

দস্যু নাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভিলুনমূর্দ্ধজৈঃ।
দীর্ঘকুচ্চৈর্মহী কীর্ণা বিবর্হৈরণ্ডজৈরিব॥

এইভাবে কৃষ্ণকায় খর্ব্বকৃতি সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে অনার্য নামে অভিহিত করা যায়। শূদ্র মাত্রেই এই অর্থে অনার্য। তবে বঙ্গদেশে সকলের অভিমত একমাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বর্ণের লোকই আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বঙ্গদেশে নাই। এরা না থাকলেও বহু সঙ্কর বর্ণ বঙ্গদেশে বাস করে। এদের মধ্যে কায়স্থ ও বৈদ্য সংখ্যা গরিষ্ঠ। এরা নিজেদের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত মনে করে। কোন বর্ণের দিক থেকে এদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করলেও শিক্ষা দীক্ষায় এবা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। এছাড়া আছে হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত। আর অসংখ্য তফশীল ও আদিবাসী। সুন্দরবন অঞ্চলে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকই বেশী বাস করে। এরা যে শিক্ষা দীক্ষায় উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলি থেকে বহুলাংশে পিছিয়ে আছে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য এরজন্য এদের বাসস্থানের ভৌগোলিক ও আর্থিক কারণ বিশেষভাবে দায়ী। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসী বৃন্দের কিছু পদবীর অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা তাদের সামাজিক দিকের কিছু আলোক পাত করতে পারি। পদবী সম্বন্ধে মনুসংহিতা ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে যে আলোচনা আছে তা প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম।
বৈশস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্য সংযুক্তম।"

(মনু সংহিতা)

"ব্রাহ্মণে দেবশর্ম্মানৌ রায় বর্মা চ ক্ষত্রিয়।
ধনোবৈশ্যে তথা শূদ্রে দাস শব্দঃ প্রযুজ্যতে।"

(বৃহদ্ধর্ম্ম পুরান)

উপরোক্ত দুইটি শ্লোক থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, 'শর্মা ও দেবশর্মা,' ক্ষত্রিয়ের 'বর্মা ও রায়বর্মা' বৈশ্যদের 'ধন' প্রভৃতি এবং শূদ্রদের 'দাস' পদবী নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ধর্মীয়, বৈবাহিক প্রভৃতি নানা কারণে পদবীর বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার পৌরাণিক যুগে বা তৎপূর্বে নামের শেষে কোন কোন পদবী যুক্ত হতো না। রামায়ণ মহাভারতেও কোন পদবীর ব্যবহার দৃষ্টি হয় না। যেমন দশরথ, জনক, ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন প্রভৃতি ব্যবহার হতো। কোন বংশ জ্ঞাপক কোন পদবী ব্যবহৃত হতো না। পরবর্তীকালেই পদবী তার বংশ পরিচয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণদের মুখার্জী, ব্যানার্জী, কায়স্থদের ঘোষ, বোস প্রভৃতি বংশ সূচক পদবী ব্যবহৃত হয়। বাঙালী ও মহারাষ্ট্র বাসী ছাড়া অন্য প্রদেশের লোকেরা পদবী ব্যবহার করে না। এই পদবীই জাতিভেদের সৃষ্টি করে, বঙ্গদেশে পাল রাজত্ব পর্যান্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থাকায় জাতিভেদ প্রকট আকার ধারণ করতে পারে নাই। কিন্তু সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রবর্তনের ফলে জাতিভেদ প্রবল হয়ে ওঠে। বল্লাল সেন কর্তৃক ৩৬টি জাতি সৃষ্টি হওয়ায় জাতিভেদ প্রথার বিষবৃক্ষ রোপিত হয়। এর জের এখনও সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়নি। যদিও আইন করে বর্ণ বৈষম্য দূর করার চেষ্টা হয়েছে। যাহোক্ এখন আমরা সুন্দরবনবাসীদের কিছু পদবী আলোচনা করে এই অধ্যায়ের যবনিকাপাত করতে চাই—

	সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ পদবীধারী অধিবাসী	জাতির নাম	উৎপত্তির সূত্র
১।	অধিকারী—	নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, মাহিষ্য	কোচবিহারের রাজবংশী পুরোহিত পদবী থেকে উদ্ভূত।
২।	আড়ী—	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত্ত	আড়ী অর্থে শিকারী আড়ালে থেকে পশু শিকার।
৩।	ওঝা—	কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ	উপাধ্যায় থেকে ওঝা বা ঝা (অপভ্রংশ)।
৪।	কর—	উগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ	করমিত্র নামের অংশ।
৫।	করণ—	কায়স্থ কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য	করণিকের কার্যে রত।
৬।	খাটুয়া—	তিলি, মাহিষ্য	ক্ষেত্রপালের অপভ্রংশ।
৭।	গায়েন—	সূত্রধর	গায়ক।
৮।	গিরি—	কৈবর্ত তিলি, মাহিষ্য	পর্বতের ন্যায় সম্ভ্রান্ত।
৯।	ঘোড়াই—	সদগোপ, মাহিষ্য	ঘরামি বৃত্তি।
১০।	চৌধুরী—	কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য	সামন্তরাজা—চৌবলের নৌ হস্তি, অশ্ব ও গজ অধিকারী।
১১।	জানা—	মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, উগ্রক্ষত্রিয়	জনপতির অপভ্রংশ অবগতকারী বিধানদাতা।
১২।	ডিঙ্গাল—	কৈবর্ত, মাহিষ্য	ডিঙ্গি চালক।
১৩।	তিয়াডী বা ত্রিপাটী, ত্রিবেদী—	ব্রাহ্মণ	তিন বেদে পণ্ডিত।
১৪।	দলুই—	উগ্রক্ষত্রিয়	দলপতির অপভ্রংশ।
১৫।	দাস—	ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, মাহিষ্য পোদ, নমঃশূদ্র ইত্যাদি	দাস-ভৃত্য-সেবক, দাশ-ব্রহ্মজ্ঞানী।

১৬। মান্না মাহিষ্য, কৈবর্ত, তিলি মহারানার অপভ্রংশ

১৭। মাইতি— ঐ মহোত্তর এর অপভ্রংশ

১৮। হালদার—পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র মাহিষ্য হাওলদার এর অপভ্রংশ।

* বিশদ বিবরণের জন্য 'পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস' খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক প্রণীত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুন্দরবনের সংস্কৃতি

॥ ১ ॥

সুন্দরবনের সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে 'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থও ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই সর্বাগ্রে আমি সংস্কৃতি বলতে ঠিক কি বুঝায় তা আলোচনা করার চেষ্টা করবো। কোন বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা করতে গেলে আদিকাল থেকেই তার আলোচনা করার রীতি এটি সর্বজন গ্রাহ্য পন্থা হয়ে উঠেছে। বেদের কাল থেকে তাই অনুসন্ধান শুরু করতে হয়। চতুর্বেদের প্রাচীনতম বেদ ঋগেদ, এই ঋগ্বেদে 'সংস্কৃতি' শব্দের কোন উল্লেখ নাই, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত, তবে ঐতরীয় ব্রাহ্মণে এই শব্দটির সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"আত্মসংস্কৃতিবাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা
ঐতের্যমান আত্মানং সংসকুরুতে।"

অর্থাৎ এই শিল্প সমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি; এগুলি দ্বারা যজমান নিজেকে ছন্দোময় ও ঐশ্বর্যময় করে। তাহলে আমরা বলতে পারি, যে সব শিল্পচর্চার মাধ্যমে মানুষের জীবন আত্মোন্নতির দ্বারা শ্রীমণ্ডিত ও ছন্দোময় হয়ে উঠে তা সংস্কৃতি। ঐতরীয় ব্রাহ্মণে হাতীর

দাঁতের কাজ, কাংস্য বা ধাতব পাত্র, বিবিধ প্রকারের বস্ত্র, স্বর্ণ নির্মিত অলঙ্কার, অশ্বতরীযুক্ত রথকে শিল্প কার্য রূপে নির্দেশ করা হয়েছে।

'সংস্কৃতি' শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ culture, Arnold এর মতে culture এর অর্থ sweetness and light—মাধুর্য ও জ্ঞান। বঙ্কিম-চন্দ্র culture শব্দের অর্থ অনুশীলন রূপে ব্যবহার করেছেন, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় culture-এর প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষ' বলে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষায়—"এই culture শব্দের মূলে আছে লাতীনের cultura 'কুলতুরা' শব্দ, এই শব্দ লাতীনের col 'কোল' ধাতু থেকে হয়েছে, col অর্থে 'কৃষ', চাষ করা, আবার 'যত্ন করা, পূজা করা'ও হয়। culture এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষ সাধন' বেশ হতে পারে। খালি 'উৎকর্ষ' শব্দও চলতে পারে।" পরে তিনি এই প্রতিশব্দটি যে তার মনোমত তা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে বলেন —"সংস্কৃতি শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি পাই প্রথমে ১৯২২ সালে প্যারিসে। আমার এক মহারাষ্ট্রিয় বন্ধুর কাছে। Culture এর বেশ ভালো প্রতিশব্দ বলে শব্দটি আমার মনে লাগে।" তিনি আরও বলেছেন যে, কবিগুরু culture এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দ পেয়ে খুব খুশী হন এবং তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। 'কৃষি' শব্দ culture এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা অনুচিত তাও তিনি মন্তব্য করেন। এর পরে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম কথা সমন্বয়। বিভিন্ন আপাত বিরোধী মতবাদের মধ্যকার ঐক্য বার করে একটি সামঞ্জস্যের চেষ্টা। তাঁর ভাষায় "ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় বড় কথা হচ্ছে এর তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। বিচারের পথে বা অনুভূতির পথে। দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত সত্য বা সত্তার অনুসন্ধানও জীবনে তার উপলব্ধি এই হচ্ছে মানুষের প্রধান কার্য্য।" তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে অহিংসা, করুণা ও মৈত্রী। তাঁর

ভাষায়—"অহিংসা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীয় কথা, এ অহিংসা কেবল প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি। আর ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাওয়ানো নয় –এর পিছনে আছে 'করুণা' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে দার্শনিকের চোখে দেখা দরদ। আর আছে 'মৈত্রী' অর্থাৎ সকলকে মিত্রভাবে দেখে তাদের মঙ্গল করার চেষ্টা।" এছাড়া তিনি আরও কয়েকটি ভারতীয় সংস্কৃতির লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে 'দম', 'ত্যাগ' ও 'অপ্রমাদ'। এক কথায় জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্য, শিব আর সুন্দরের আবাহনের মধ্যে সংস্কৃতির প্রকাশ। আর সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। জীবন যেমন গতিশীল সংস্কৃতি ও সভ্যতা ঠিক তেমনি গতিশীল। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। দ্রাবিড় সংস্কৃতির পর এসেছে আর্য সংস্কৃতি। আর্য হিন্দু সংস্কৃতি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করার পর এসেছে ইসলামীয় সংস্কৃতি। মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির জোয়ার। এখন ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বিশুদ্ধ হিন্দু নয়, ইসলামও নয় আবার ইউরোপীয়ও নয়। এ সংস্কৃতি এক সংমিশ্রিত বিশ্ব সংস্কৃতি।

ঐতরায় ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমার প্রভৃতি মনীষিগণের বক্তব্যগুলি আলোচনা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কৃষি কালচার সংস্কৃতি গ্রন্থে। —"খাদ্যোৎপাদন ও সন্তান প্রজনন থেকে শুরু করে সঙ্গীত ও নৃত্য, শিল্প ও সাহিত্য, স্মৃতি এবং সংস্কার বাসনাহীন অধ্যাত্ম সাধনা পর্যন্ত, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানুষ নিজেদের জীবনের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য যত কর্মে লিপ্ত হয়, সে সমস্ত কর্মই জীবনকর্ষণ কর্ম। সমস্তই সংস্কৃতি কর্ম এবং সে কর্মের ফলশ্রুতি কৃষি, সংস্কৃতি।" একথা আমরা ভূমিকা অংশে উল্লেখ করেছি। এরপর মনীষী সুনীতিকুমার এবং নীহাররঞ্জন রায় একমত যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা সর্বদেশে নগর কেন্দ্রিক। সুনীতিকুমারের ভাষায়—"সভ্য আর অসভ্য সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীসে

ভারতে এই ধরনের মনোভাব ছিল—নাগরিকই সভ্য, গ্রাম্যই অসভ্য।" "মানুষ বিশেষভাবে নিজেকে জানবার প্রথম চেষ্টা করে প্রাচীন গ্রীস দেশে যেখানে মানুষের জীবনের কেন্দ্র, চিন্তার কেন্দ্র ছিল নগরে, যেমনটা প্রায় সব দেশেই হয়ে থাকে।" ভারতবর্ষেও প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মূল কেন্দ্র ছিল নগর। সুনীতিকুমার বলেছেন—'সংস্কৃতে সভ্য শব্দের মুখ্য অর্থ—যা সভার উপযুক্ত, বাংলায় 'সভ্যতা' শব্দ সভ্য ও সভা থেকে এসেছে তাঁর ভাষায় সভার সঙ্গেই যা জড়িত, সভা থেকেই অর্থাৎ মানবগণের সংগমন বা সমাগমন থেকে, একত্রীভবন থেকে যা উঠেছে তাকেই আমরা 'সভ্যতা' বলি।' সভ্যতার ইংরেজী প্রতিশব্দ Civilization। তিনি দেখিয়েছেন লাতীন civis শব্দ থেকে civilization শব্দের উৎপত্তি। আর civis মানে নগর। সভ্যতার আরবি প্রতিশব্দ 'তমদ্দুন।' তমদ্দুন শব্দটি আবার এসেছে মূল আরবি 'মুদান' শব্দ থেকে। যার অর্থ নগর। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় বলা যায়—"সংস্কৃতি অর্থ ততটি নয় যতটি সভ্যতা বা নাগরিকতা অর্থে আরবি ভাষায় তমদ্দুন কথাটির ব্যবহার প্রচলিত আছে। তমদ্দুন কথার মূলে আছে আরবি 'মুদান' শব্দ যার অর্থ হচ্ছে নগর যে শব্দ থেকে মদিনা শহর নামের উৎপত্তি", এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরোক্ত উদ্ধৃতি এবং আলোচনা থেকে অন্তত প্রতীয়মান হয়েছে যে সংস্কৃতির দুইটি দিক আছে—একটি তার পার্থিব দিক আর অপরটি তার আধ্যাত্মিক দিক। খাদ্যোৎপাদন থেকে সন্তান প্রজনন প্রভৃতি প্রথমটির অন্তর্গত। আর নৃত্য, সঙ্গীত, শিল্প সাহিত্য ও ধর্মসাধনা প্রভৃতি দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত। মনীষী সুনীতিকুমারের মতে ভারতীয় সংস্কৃতির শেষোক্ত দিকটির পরিচয় মেলে নগর থেকে বহু দূরে অবস্থিত তপোবন আশ্রমে। আর পার্থিব উৎকর্ষের ক্ষেত্র নগরই ছিল।

বর্তমান সংস্কৃতির দুইটি বিভাগ। একটিকে বলা হয় নাগরিক

সংস্কৃতি আর অপরটিকে বলা হয় লৌকিক সংস্কৃতি। এতক্ষণ যা আলোচনা হয়েছে তার থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকেই নাগরিক সংস্কৃতি বলা যায়। এখন তাহলে জানা প্রয়োজন আমরা লৌকিক সংস্কৃতি কাকে বলতে পারি। লৌকিক সংস্কৃতির ইংরাজী প্রতিশব্দ Folklore প্রখ্যাত লোক সংস্কৃতিবিদ্ টেলার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য —"Falklore is the materi il that i; hand:d on by traditi m either by word or mouth or bv cust m and practice. It may be falk-songs, falkta'es,ri ld'es, proverbsor other materials preserv:d in words." অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি হচ্ছে সেই উপাদান যা মুখে মুখে, আচার-ব্যবহারে এক একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত থাকে। "বাংলা লোকসাহিত্য চর্চ্চার ইতিহাস" গ্রন্থে ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয় লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,—"একই রূপ ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক পরিবেশ এক এক জনগোষ্ঠী যে আচার, আচরণ, জীবনচর্চা, সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলা ইত্যাদির ঐতিহ্যানুযায়ী অনুশীলন করে তাহাই লোক সংস্কৃতি।" লোকাচার, লোকসংস্কার, লোক উৎসব, লোকশিক্ষা, লোকনৃত্য লোকধর্ম, লোকসাহিত্য প্রভৃতি সবই লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত,— ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ভাষা ও সাহিত্য

॥ ২ ॥

আমরা পূর্বে বলেছি যে সুন্দরবনের সমাজ লৌকিক সমাজ। সুতরাং, এইরূপ একটা বিশেষ ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে বিশেষ একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যে লৌকিক সংস্কৃতি মূলক সংস্কৃতি তা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন উল্লেখযোগ্য

এই নগরহীন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন লবণাক্ত জলপ্লাবমান উপকূলবর্তী গাঙ্গেয় ব দ্বীপস্থ সংস্কৃতি নাগরিক সংস্কৃতি-রূপে অভিহিত হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য— সুতরাং সুন্দরবনের সাহিত্য যে লোকসাহিত্যর অন্তর্ভূক্ত হবে সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ খুবই কম। এখন তাহলে আমাদের আলোচ্য বিষয় লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি সুন্দরবন অঞ্চলে কিভাবে ছড়িয়ে আছে তার অনুসন্ধান করা। বিশেষজ্ঞের মতে— লোক সংস্কৃতির প্রাণ লোকসাহিত্য, আর লোকসাহিত্যের প্রাণ লোক সঙ্গীত। সংস্কৃতির সমৃদ্ধতম বিভাগ হচ্ছে সঙ্গীত, কারণ সঙ্গীতের দ্বারা একটি জাতির ধ্যান-ধারণ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ পায়। "বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাণ হ'ল সঙ্গীত। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে সঙ্গীতের ভিত্তিভূমির উপরেই বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাসাদটি অবস্থিত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতি।"--ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয় এই মন্তব্য করেছেন। প্রখ্যাত লোক-সংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আরও স্পষ্টভাবে করে সঙ্গীতের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেছেন—"বাংলা দেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা তত সহজ নহে। প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদই তাহার সঙ্গীত, বাঙ্গালীর ধ্যান-ধারণা, সামাজিক আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীতসাধনায় যে বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাইবে না।" বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর দ্রষ্টব্য। একথা ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেমন সত্য বাংলার লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের 'বঙ্গভাষা' কবিতার পংক্তিগুলি তুলনীয়।

"কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

* * * *

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
ঐ ফুলেরই মধুর রসে—
বাঁধল সুরে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগৎ জিনে।
তোমার চরণ তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া আসা।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' নামক বিখ্যাত কবিতার দুটি ছত্র এখানে স্মরণ করা আবশ্যক

"কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপন নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।"

কীর্তন আর বাউলের গান বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। ভারতীয় সঙ্গীত ভাণ্ডার এদের সংযোজনে যে সুসমৃদ্ধ হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সঙ্গীত বা লোক সঙ্গীতের মাধ্যমে মনের গোপন দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। উচ্চ রাগপ্রধান সঙ্গীত অপেক্ষা সহজ প্রাণ মাতানো লোক সঙ্গীতের আবেদন নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে খুব প্রিয় ও আকর্ষণীয়। ডঃ চক্রবর্তীর ভাষায় "ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ কিংবা লোককথার তুলনায় লোক সঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ তার সুরে।... আর এই সুরে এমন এক মাদকতা আছে যা সহজেই শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে।" একথা অনস্বীকার্য যে গ্রামবাংলার অগণিত নিরক্ষর মানুষের চিত্তবিনোদন ও অবসর সময় অপনোদনের একমাত্র উপকরণ লোক-

সঙ্গীত। নৌকার মাঝি, মাঠের কৃষক, সকলের মুখে মুখে ফিরে এই লোক সঙ্গীতগুলি। আঞ্চলিক পরিবেশের পার্থক্যানুসারে লোক-সঙ্গীত-গুলির প্রকারভেদ দেখা যায়। যেমন মালদহে গম্ভীরা, পুরুলিয়ার টুসু, উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়া প্রভৃতি। বিশেষজ্ঞগণ এই সঙ্গীতগুলির মর্মানুসারে বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে সারি, জারি, নৌলা, পর্ব ও বারমাস্যা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। সারি সারি নৌকায় বসে বা দাঁড়িয়ে যে গান গাওয়া হয় তাহা সারিগান নামে পরিচিত। গঙ্গা-বন্দনাই গানগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু জারি গানকে মুসলমানী গান বলে, নৌলা একপ্রকার ভজন আর পর্ব হচ্ছে ধর্মের গান।

সুন্দরবন অঞ্চলে য লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে তা গাজী সাহেবের গান এবং বনবিবির গান নামে পরিচিত। "২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার এবং বারুইপুর অঞ্চলে এই গান প্রচলিত। বারুইপুরের রায়চৌধুরী বংশ যখন প্রতিষ্ঠিত তৎকালে তাঁদের পূর্বপুরুষ মদন রায় পীর কাজী সাহেবের কৃপায় নবাবের কোপদৃষ্টি থেকে কেমন করে রক্ষা পেয়েছিলেন তারই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে 'গাজী সাহেবের গানে'। তখন বাংলায় শায়েস্তা খাঁর আমল। সে-সময়ে ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল তাও এই গানের মধ্য দিয়ে বেশ বোঝা যায়।" এই উক্তি করেছেন ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী। নদীমাতৃক সুন্দরবনের একমাত্র যানবাহন নৌকা। নৌকার মাঝি-মাল্লাদের ভাটিয়ালী সুরে গান পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলের একটি মূল্যবান সম্পদ। যশোহর-খুলনা অঞ্চলে আর একরকম লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। সেগুলি 'গুরুসত্য সঙ্গীত' নামে পরিচিত।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—লোক-সংস্কৃতি প্রধান দুটি বিভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে লোক-সাহিত্য অপরটি লোকশিক্ষা। আমরা উল্লেখ করেছি লোকসঙ্গীত লোক-সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ। তাই সংক্ষেপে লোকসঙ্গীতের কথা

আলোচনা করেছি। এখন অন্য অংশগুলির কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। তার পূর্বে লোকসাহিত্য কাকে বলে তা সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া দরকার। পাশ্চাত্য পণ্ডিত উটলে বলেছেন,— 'Folk literature is simply literature transmitted orally.' অর্থাৎ 'লোকসাহিত্য হলো সেই সাহিত্য যা স্রষ্টার মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখেই প্রসার লাভ করে ও জীবিত থাকে। লোক-সাহিত্যের আর এক বৈশিষ্ট্য হলো এই সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের রচিত হলেও পরবর্তীকালে তা সমাজের সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এখানে উচ্চতর সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য। যা হোক, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ আছে, সেগুলো হলো যথাক্রমে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, লোক-কথা, লোক-সঙ্গীত ও গীতিকা। পূর্বে দেখেছি যে সুন্দরবন অঞ্চলে লোক-সঙ্গীতের নিদর্শন আছে, লৌকিক দেব-দেবী অংশে এর বিশদ বর্ণনা করবো। তাই এখন গীতিকা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার, বৃহত্তর সুন্দরবনে এর উল্লেখ আছে। বৃহত্তর সুন্দরবন বলতে আমরা হুগলী নদী থেকে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল উপকূলবর্তী ভূখণ্ডকে বুঝতে চাই। প্রথমে গীতিকা কাকে বলে তা জানা প্রয়োজন। গীতিকার ইংরাজী প্রতিশব্দ ballad. পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মতে – "the ballad is a falk-song that tells a story" অর্থাৎ Ballad হচ্ছে একটি লোকসঙ্গীত যা একটি কাহিনীর অবতারণা করে। এক কথায় বলা যায়, ballad একটি কাহিনী-মূলক লোক-সঙ্গীত, বাংলা গীতিকাগুলি বর্ণনা প্রধান। "গীতোপ-যোগী প্রেম বিরহ মিলনকেন্দ্রিক কাহিনী লেখকের আত্মোপলব্ধির জারক রসে জারিত হয়ে একই রূপ ছন্দে বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ পরিসরে বর্ণিত হয়ে গীতিকা আখ্যা লাভ করেছে"। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয় এই সংজ্ঞা দিয়েছেন। যা হোক, বাংলা গীতিকা তিন প্রকার ; যথা—নাথ, গীতিকা, ময়মনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-

গীতিকা। সুন্দরবন অঞ্চলে এরূপ গীতিকা পরিদৃষ্ট হয় না। তবে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বৃহত্তর সুন্দরবনের নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু কিছু পালাগানের পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি। "পূর্ব-ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলি 'ব্যালাড' (গাথা বা গীতিকা সাহিত্য) সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজী Ballad শব্দটি প্রাচীন লাতিন ballare হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে যাহার অর্থ নৃত্য। পূর্বে পাশ্চাত্যে যে-সমস্ত কাহিনীকে নৃত্যগীতে পরিবেশন করা হইত তাহাকে ballad বলিত। প্রথম-দিকের ব্যালাডে বিশেষ কোন কাহিনী ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে যুদ্ধবিগ্রহ, প্রেম প্রণয় প্রভৃতি বিষয় গীতিধর্মী লোককাহিনী প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। আদিম যুগে জনসাধারণ যে-সমস্ত ঘটনা অবলম্বনে নৃত্যগীতে মত্ত হইত তাহাই ক্রমে গীতাত্মক কাহিনীর রূপ গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য এই লোক সাহিত্য প্রাচীন-কালে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। "কালক্রমে এই সমস্ত লোক-গাথা মহাকাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে" (বা, সা ই—২/১) তারপর তিনি বলেছেন, "বিশুদ্ধ গাথাগীতিকা সাহিত্যের যথার্থ দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ, পূর্ববঙ্গ গীতিকার' এই গাথা-গীতিকা সাহিত্য প্রচারের জন্য যার নাম বাংলা লৌকিক-সাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। তবে যবনিকার অন্তরালে যিনি এই বিরাট কর্মযজ্ঞে সাহায্য করেছিলেন তাঁর নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি হলেন ময়মনসিংহের এক দরিদ্র সন্তান চন্দ্রকুমার দে।

লোকসঙ্গীত ও গীতিকার পরে আবার লোক-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন শাখা ছড়ার ভূমিকার কথা আলোচনা করেন ডঃ অসিতকুমারের ভাষায়—উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে সম্পূর্ণ নূতন দিকে পরিবর্তন হইল, তাহার আভাস অষ্টাদশ শতাব্দীর

লৌকিক ছড়া-পাঁচালীতে লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা—মানবতন্ত্রবাদ, এবং লৌকিকতাই সেই মানবতন্ত্রবাদের নিয়ামক শক্তি। সেই লৌকিকতার অর্থ—ইহলোক, বাস্তব পরিবেশ ও পার্থিব সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে কবিদের সচেতন উপলব্ধি। এখন 'ছড়া' শব্দটির অর্থ সমন্ধে দু'এক কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। 'ছড়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ছড়ানো, যেমন 'গোবর ছড়া।' আবার অন্য অর্থে গুচ্ছ, যেমন 'কলার ছড়া।' তৃতীয় অর্থে গ্রাম্য কবিতা'. স্বনামধন্য ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও অনুরূপ অর্থ করেছেন। তাঁর মতে ছড়া শব্দটির অর্থ—(১) প্রকীর্ণ, বা বিক্ষিপ্ত ছড়ানো, (২) গ্রথিত গাথা মালা। (৩) ছুটকো ছন্দময় রচনা। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর কাব্যিক ভাষায় বলেছেন.—"ছড়া পরিতৃপ্ত মাতৃত্বের উল্লাস। যেন চন্দ্রোদয়ে স্ফীত তটিনীর কল্লোচ্ছ্বাস—" তার 'বাংলা সাহিত্যে মা' গ্রন্থে তিনি বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"সাধারণত বাঙালী মায়ের মূর্তি দুঃখিনী মূর্তি। কিন্তু ছড়ায় মাতৃমূর্তি কৌতুকময়ী ও হাস্যোজ্জ্বল। মা এখানে পূর্ণকাম ও পরিতৃপ্ত। বুক জুড়ানো ধনকে নিয়ে তিনি উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত ও ধন্য। পরিতৃপ্ত জননীর এই হাসিভরা মুখখানি ছড়ার দর্পণে প্রতিবিম্বিত।" —আবার অন্যত্র বলেছেন—"উষা ও প্রভাত যেমন একই প্রতিঃ সন্ধ্যার দুইরূপ, তেমন একই মায়ের দুটি রূপ ফুটে উঠেছে বাংলার ব্রতে ও ছেলেভুলানো ছড়ায়। ডঃ সেন ছড়াকে 'শিশুবেদ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়—'যে-রচনা কোন ব্যক্তি বিশেষের তৈরী বলে নির্দিষ্ট করা যায় না,—যা কোন এক মানবগোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে কর্মে চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে, তাকে যদি বদনাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরাধেয়। ছেলেমি ছড়া গাল-গল্পকে শিশুবেদ বললে বোধ করি খুব অসঙ্গত হবে না।' ডঃ সেন শ্রোতার বয়স ও প্রয়োজন অনুসারে ছড়াগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—ঘুম পাড়ানি, মন ভোলানি ও খেলা চালানি। এই শ্রেণীভেদ

বিষয়ে অবশ্য অনেক মতভেদ আছে। যা হোক্ ২৪ পরগণা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর অঞ্চলে বহু ছড়া ডঃ ভবতারণ দত্ত এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, ডঃ ভট্টাচার্য ও ডঃ দত্ত প্রভৃতি সকলে একমত যে, বাংলা ছড়াগুলির মধ্যে বাংলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। 'অনেক দিনের অনেক হাঁসিকান্না' ছড়াগুলির মধ্যে বিধৃত। 'প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলা দেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সঙ্গীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।'

বঙ্গ সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যের প্রধান প্রধান শাখাগুলির আলোচনা আমরা সংক্ষেপে এযাবৎ করেছি। অবশিষ্ট শাখাগুলি অর্থাৎ প্রবাদ ধাঁধা প্রভৃতি লোক-সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা আলোচনাকে নাতিদীর্ঘ করার উদ্দেশ্যে অবশিষ্টাংশগুলির বিশদ আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। শুধু এই কথা বলে লোকসাহিত্য অংশের আলোচনার উপসংহার করতে চাই যে-ছড়া যেমন দেশে-বিদেশে Nursery Rime হিসাবে চিরসমাদৃত, প্রবাদ ও ধাঁধা অর্থাৎ proverbs ও riddles সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যের রাজ্যে রাজকীয় মর্যাদা লাভ করে এসেছে। প্রতি দেশের লোকসাহিত্যের উপরোক্ত শাখাগুলি দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির একটি স্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে এদের সর্বাধিক প্রচলন ছিল তা উপরোক্ত লেখকদের গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—ডঃ সুশীল কুমার দে রচিত 'বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্গত 'প্রবাদ' সম্পর্কিত ৬ষ্ঠ অধ্যায়। ডঃ বরুন চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাষায়—"এ পর্যন্ত বাংলায় যতগুলি প্রবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আলোচ্য সংগ্রহটি বৃহত্তম, সর্বমোট ১১,৫০৭টি প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ আলোচ্য সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে। অর্থাৎ বর্তমান সঙ্কলনে ডঃ সুশীলকুমার দে'র সংগ্রহের তুলনায় ২,৪০৭টি বেশী প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ

সংযোজিত হয়েছে।" লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির অপর দুটি শাখা—ধাঁধা (Riddles) এবং লোককথা (falkta'es) খুব ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ—স্থান অধিকার করে আছে। উপরোক্ত লোক-সাহিত্যের গ্রন্থকার ব্যতীত শ্রীঅজিতকুমার বেরা মহাশয়ের 'মূকে বুঝিবে কিবা' 'ধাঁধায় আনাবস' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য, লোককথা বা কাহিনী বিষয়ে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও অঘোর চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম চন্দ্র যেমন সাহিত্য সম্রাট অভিধায় ভূষিত 'কথা সাহিত্য সম্রাট' অভিধায় তেমন সার্থকভাবে ভূষিত হয়েছেন যিনি, তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার"—ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী এতে মন্তব্য করেছেন। বহু প্রচারিত ও সর্বজন সমাদৃত 'ঠাকুমার ঝুলি ও ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতি তিনি সংগ্রহ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ঢাকা-ময়মনসিংহে এঁর জন্ম। মেয়েলী ব্রতকথা লিখে যশস্বী হয়েছেন অঘোরকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাংলা লোককথা চর্চার ইতিহাসে আর একজনের নাম উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সেই স্মরণীয় নাম, 'টুনটুনির বই' লোককথা-সাহিত্যে তাঁরই অভিনব সংযোজন এঁর জন্ম ময়মনসিংহ জেলার মযুয়া গ্রামে, গীতিকার জন্যে এই জেলাটি যেমন সুপ্রসিদ্ধ লোককথার জন্যও ঠিক সমভাবে সকলের কাছে সুপরিচিত, চট্টগ্রাম, বিক্রমপুরের নামও সমভাবে উল্লেখযোগ্য

তৃতীয় অধ্যায়

—ঃ লৌকিক দেবদেবী ঃ—

বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর উৎপত্তি ঃ –

॥ ১ ॥

লৌকিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান লৌকিক ধর্ম, যার কেন্দ্রে আছে বহু লৌকিক দেবদেবীর পূজা।

বারমাসে তের পার্বন আর তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজার কথা সর্বজন বিদিত। কিন্তু এই দেবদেবীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ঋগ্বেদের বিশিষ্ট ভাষ্যকার সায়নের এবং অন্যান্য ভাষ্যকারদের মতে বৈদিক দেবদেবী ছিলেন মাত্র ত্রেত্রিশ জন। পুরানের যুগে বহু দেবদেবীর কল্পনার ফলে দেবদেবীর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে স্থানীয় ভিত্তিতে বেদ-পুরাণ বহির্ভূত হিন্দু মুসলমানের বহু কাল্পনিক দেবদেবী অথবা দেবতা ও উপদেবতা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক অপদেবতাও আবার দেবতারূপে কিছু কিছু তান্ত্রিক বা তমোগুণ সম্পন্ন কদাচারী ব্যক্তিগণের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। যতদূর জানা যায়, বৈদিক যুগে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ চন্দ্রমা, সূর্য নক্ষত্র, প্রাণ, আপন, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কুর্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বিদ্যুৎ ও যজ্ঞ প্রভৃতি তেত্রিশ জন মূল দেবতারূপে পূজিত হতো। শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতের অনুশাসন পর্বে নিম্নরূপ ৩৩ দেবতার নাম আছে, যথা ১২ আদিত্য, ১১ রুদ্র এবং ৮ বসু আরদ্যাবা ও পৃথিবী। নামগুলি যথাক্রমে— আদিত্য অংশভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্যামী, জয়ন্ত, ভাস্কর ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র-অজ, একপদ, অহিব্র, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন, সম্বর, বসু, ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা,

অনিল, অমল, প্রত্যূষ, প্রভাস। দুর্গা, বাসন্তী, কালী জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি পূজা অতি আধুনিক কালে প্রচলিত। ৪০০ থেকে ২০০ বৎসর পূর্বে এই পূজার প্রচলন হয়েছে। যেমন তাহিরপুরের কংস নারায়ণ জমিদার ষোড়শ শতকে দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন। এই শতকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কালীপূজার পত্তন করেন। বাল্মিকীকৃত মূল রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কোন দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাস ওঝা কর্তৃক বাংলা রামায়ণে এই পূজার উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রপূজা করে রাবণ বধ করেন। এই কাহিনী বাল্মিকীর রামায়ণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং পৌরাণিক যুগেই এবং তৎপরবর্তী যুগে বহু দেবদেবীর সৃষ্টি। যা হোক্, এখন আমরা সুন্দরবনের লৌকিক দেবদেবীরা কি ভাবে পূজিত হন তার আলোচনা করবো।

বৈদিকযুগে যেরূপ দেবদেবিগণ মানুষের কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন মূর্তি গ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেইরূপ সুন্দরবনের পূজিত দেবদেবিগণ আদিম সুন্দরবনবাসীর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করেছেন। বৈদিক যুগে নিরুক্তকার সজ্ঞের মতে দেবতার সংখ্যা মাত্র তিনটি। যথা—দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা সূর্য, অন্তরীক্ষ বা আকাশের দেবতা বায়ু, পৃথিবীর দেবতা অগ্নিরূপে কল্পিত ও পূজিত হতো। এমন কি পর্বত, বনস্পতি, সোম-নিষ্কাশনের-পাথর, তীরধনুক প্রভৃতি নানা আয়ুধ দেবতারূপে স্তুত হতো। অথর্ববেদের এক দেবতার নাম উচ্ছিষ্ট। ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে শ্রদ্ধা, জ্ঞান প্রভৃতি অমূর্ত ধারণাও দেবতারূপে পূজিত ও স্তুত। এরা গৌণ দেবতা। তবে এইসব ধারণা থেকে পৌরাণিক যুগের দেবদেবিগণ প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে উঠেছেন। যেমন বিষ্ণু ছিলেন বৈদিকযুগের অতি গৌন দেবতা কিন্তু পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুর মহিমা এত বিশাল আকার ধারণ করেছে যে, তাকে কেন্দ্র করে বিষ্ণু-পুরাণ নামে এক বিশালাকার পুরাণ রচিত হয়েছে। বেদে বিষ্ণুর ত্রিপাদ অর্থাৎ সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্ন প্রখরতা ও অস্তকে কেন্দ্র করে বিষ্ণু ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্তা,

পালনকর্তা এবং লয়কর্তার গুণ আরোপিত হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ দেবতা-রূপে পৌরাণিক যুগে পূজিত ও স্তুত হয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি কল্পনা বিশেষ বিশেষ মূর্তি ধারণ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিদেশ এবং মহেশ্বর তার অঙ্গ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। এইভাবে বিষ্ণুর অঙ্গ-উপাঙ্গ থেকে বহু দেবদেবী, যক্ষ, রক্ষ, মানুষ, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি স্থাবর-জাঙ্গমের সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবনের দেবদেবীও এই ভাবধারার স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। তবে বহু পরবর্তী কালে সৃষ্ট হয়েছে বলে সুন্দরবনের দেবদেবী-কল্পনায় হিন্দু-ইসলামীয় প্রভাব দেখা যায় মুসলমান ও হিন্দুদের যৌথ সংস্কৃতি ও কামনা-বাসনার প্রতীক স্বরূপ বহু দেবদেবী সৃষ্ট হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম বলতে পারি সুন্দরবনের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি। এই যৌথ সংস্কৃতি বা কামনা-বাসনার মূর্ত প্রতীক ইনি উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী কর্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে পূজিতা হন।

বনবিবি

॥ ২ ॥

বনবিবি মূলতঃ মুসলমানের কল্পনাপ্রসূত এক দেবীমূর্তি। কিন্তু মুসলমানরা পৌত্তলিক নয়। সাধারণতঃ তারা কোন দেবদেবীর পূজা করে না। কিন্তু এই বনবিবি মুসলমানের কাছে সমানভাবে পূজা আদায় করেন। সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর নরখাদক সাক্ষাৎ যমসদৃশ রয়েল ব্যাঙ্গল টাইগারের ভয়ে মুসলমানেরাও প্রাণে বাঁচার তাগিদে বনবিবিকে, পূজা দিতে বাধ্য হয়। দেবীর নাম তাই বনবিবি। তবে উভয় সম্প্রদায়ের দেবীমূর্তি কল্পনায় কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এই দেবীর মূর্তি অনেকটা সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সুন্দরী মহিলার মত। হিন্দু অঞ্চলে ব্যাঘ্রবাহিনী

চণ্ডীর ন্যায়। বহুবিধ মূল্যবান অলঙ্কার ও দামী পোষাক-পরিচ্ছদে সমাবৃতা। বিবি অর্থে ধন বিলাসিনী বুঝায়। ঐই দেবী যেন মুসলমানদের নিকট অনেকটা সেইরূপ মূর্তি নিয়ে আবির্ভূতা। 'বন-বিবির 'জহুরানামা' নামে যে পাঁচালী পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় বনবিবি এবরাহিম নামে এক ফকিরের কন্যা, এর ভাইয়ের নাম জঙ্গাল সাহা। মাতার নাম গুলাল বিবি। ইনি এবং ইনার ভাই দক্ষিণারায়ের অত্যাচার থেকে বনবাসীদের রক্ষা করার জন্য আল্লার আদেশে এই সুন্দরবন অঞ্চলে বা বাদাবনে আবির্ভূতা হন। জহুরা-নামাতে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—সন্ধী বয়নদ্দী কর্তৃক এই কেচ্ছা রচিত।

দণ্ডবক্ষ যদি মৈল পুত্ররাজ্য পেল
দক্ষিণারায়ের নাম প্রকাশ হইল ॥
বহুলোক দিত পূজা ভয় যে করিয়া।
অত্যাচার করে খায় মানুষ ধরিয়া ॥
রাক্ষসের মত মানুষ খাইতে লাগিল।
কেহ তার প্রতিকার করিতে নারিল ॥
আদম জাতের পরে আল্লা মেখাবান।
আলেম গায়েব তিনি রহিম রহমান ॥
বনবিবি সা জঙ্গলিকে ভেজে দুনিয়াতে।
হুকুম হইল যাও আঠার ভাটিতে ॥

উদ্ধৃত অংশ থেকে আমরা জানিতে পারি দক্ষিণারায় ছিল দণ্ডবক্ষের পুত্র। এর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে করবো। এখন আমরা "বনবিবি" সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করছি। বনবিবির জন্মবৃত্তান্ত খুবই চিত্তাকর্ষক।

কারণ বনবিবির জন্মদায়িণী মাতাকে তার পিতা নির্জন বাদাবনে গর্ভাবস্থায় তার প্রথম স্ত্রীর প্ররোচনায় বা তাড়নায় বিসর্জন দেয়। গভীর জঙ্গলে অতি অসহায় অবস্থায় তার মাতা যমজসন্তান প্রসব

করে। মাতা নিঃসহায় হয়ে কন্যাকে ত্যাগ করে শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। এক হরিণীর দ্বারা আল্লার আদেশে বনবিবি পালিতা হন। পাঁচালীকার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :—

এক দেশ হইয়া নাম লইয়া আল্লার।
শোন কেচ্ছা বনবিবি জহুরা নামার॥
বনবিবি সা জঙ্গলি ভাই ও বহিন।
যেরূপে হইল পয়দা শোন হে মোমিন।
এব্রাহিম নামে আছিল ফকির।
মক্কার বাসিন্দা করে আল্লার জিকির॥
জওয়ামি উম্মরে করেছিল সাদিকাম।
কবিলা তাহার ছিল "ফুলবিবি" নাম॥

এব্রাহিমের প্রথমা বিবির নাম ছিল ফুলবিবি। ফুলবিবির কোন সন্তান না হওয়ায় বৃদ্ধ বয়সে এব্রাহিম গুলাল বিবিকে বিয়ে করে। দ্বিতীয়া স্ত্রী আল্লার কৃপায় গর্ভবতী হলে ফুলবিবি তার প্রতি বিরূপ হয় এবং তার স্বামীকে গুলালবিবিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। তাই পাঁচালীকার বলেছেন—

বুড়াকালে সাদী কৈনু অনেক দুঃক্ষেতে,
হাসেল হইল বিবি খোদার রহমতে॥
* * * * * * *
অবলা না জানে ছল চাতুরী কেমন।
ফুলবিবি হইল এর জানের দুসমন॥

এই দুসমন ফুলবিবির জন্য "বনবিবি"—মাতা কর্তৃক পরিত্যাক্তা হয়ে সাত সাল হরিণদের দ্বারা প্রতিপালিতা হয়েছিল। "ক্রমে ক্রমে সাত সাল গেল গোজারিয়া।

"বনের হরিণ যত খোদার ফরমানে।
বনবিবিকে পারওয়ারেশ করে সেই বনে॥

গুলালবিবি সা জঙ্গালিকে নিয়ে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে বনবিবির সঙ্গে আল্লার কৃপায় একসঙ্গে মিলিত হয়।

বোনবিবি শা জঙ্গলী এক সেকমতে।
পয়দা হৈয়া জুদা হৈল খোদার কুদরতে ॥
জুদা জুদা ভাই বহিন পরওয়ারেশ হইল।
কেহ কার সাথে দেখাশোনা নাহি ছিল।

ভাইবোন একসঙ্গে মিলিত হবার পর তাদের ভাটির সুদূরে যাবার জন্য খোদার হুকুম হলো। তাই পাঁচালীকার বলেছেন—

বাদাবনে যাও দোহে ভাটির সহরে।
এয়ছাই হুকুম হৈল ভাই বহিনেরে ॥

কিছুদিন পরে এব্রাহিম তাব দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বনে গুলালবিবিকে খোঁজ করতে এসে পত্নী ও পুত্রকন্যার সাক্ষাৎ পায় এবং পত্নীকে রাজী করিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বনবিবি ভাইকে বললো—

শা-জঙ্গলিকে হেঁকে বলে কোথা যাও ভাই।
মা বাপের সাথে যাওয়া আবশ্যক নাই ॥
*   *   *   *
আঠার ভাটিতে যেতে হবে আমাদেরে।
খোদার হুকুম এয়ছা আমাদের পরে ॥
আমাদের জহুরা জাহের সেথা হবে।
খবরদার মা বাপের সাথে না যাইবে ॥

এই কথা ভগিনীর মুখে শুনে সা-জঙ্গলি বোনের কাছে থেকে গেল। বিষণ্ণ মনে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে পিতামাতা পুত্রকন্যার নিকট বিদায় নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে যায়। আর বনবিবি পিতামাতাকে বিদায় দিয়ে ভাইকে নিয়ে মদিনাতে গমন করে এবং সেখানে গিয়ে কামেল নবীর আওলাদের কাছে মুরিদ হয় এবং কালাম শিক্ষা করে। তাছাড়া ভাইবোন দুজনে নবীর রওজায় গিয়ে দরুদছালাম

প্রত্যহ ভজনা করে। তারপর জেন্নাতল বাকিয়াতে গিয়ে ফাতেমাবিবি রওজা শরিফে পৌঁছায়। সেখানে তাঁর ভজনা করে, এবং তাঁর আশির্বাদ লাভ করে আঠার ভাটির অধিষ্ঠাত্রী হয়। আরও বর লাভ করে যে বনে কিংবা রণে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। আর তার উপর খোদার নির্দেশ থাকে, যদি কেউ কখনো বিপদে প'ড়ে তাকে স্মরণ করে তবে তাকে যেন বনবিবি উদ্ধার করে এবং সর্বপ্রকার বিপদমুক্ত করে।

এই কাহিনীর নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

> খোদার মদদ চাহ শুনহ খবর
> আঠার ভাটিতে যাহ দোঁহে তৎপর ॥
> আল্লাপাক তোমাদের কাছে মদদগার
> পয়দা করিয়াছে জাত আঠাব হাজার ॥
> তাহা সবাকার মা হইয়া আছি আমি।
> মা হইবে আঠাব ভাটির তেয়ছা তুমি ॥
> মুস্কিলে পড়িয়া যে বা ডাকিবে তোমায়।
> উদ্ধার করিবে তাকে ভাবিয়া খোদায় ॥

এইভাবে ভরপ্রাপ্তা হয়ে বনবিবি ও শা জঙ্গলা মদিনা শহর থেকে নেকালিয়া যায়। তারপর তারা হিন্দুস্থানে আসিয়া গঙ্গানদী পার হয়ে ভাঙ্গড় শাহার নিকট আসে। ভাঙ্গর শাহা তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের পবিচয় জিজ্ঞাসা করতে বনবিবি নিম্নরূপ পরিচয় বা উত্তর দেয় এবং তার কাছে ভাটির দেশের পরিচয় ও ভাটিদেশ দখল করার কৌশল অবগত হয়।

> চিনিতে না পারি আমি দেহ পরিচয়।
> বিবি বলে ভাই বহিন মোরা দুজনায় ॥
> মদিনা শহর হইতে পৌঁছিনু আসিয়া।
> রুছুলের রওজা হইতে খেলা-ফত লিয়া ॥
> রওজা হইতে খেলকা টুপী আতাফরমাইল।

জায়গীর আঠার ভাটি এনায়েত হইল ॥
বাদাবন যাব মোরা সেই ছফরতে।
বাতাইয়া দেহ যাব কোন তরফেতে ॥

ভাঙ্গড় শাহা যে উত্তর দেয় তার থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণা রায় ভাটির অধীশ্বর ছিল এবং সে খুব দুষ্মন ছিল। প্রথমে এই সব স্থান অধিকার করার পরামর্শ দেয়। পরে চান্দখালি, রায়মঙ্গল, শিবাদহ দখল করতে বলে। তবে চান্দখালির বিচে চান্দ যেখানে আছে সেখানে যেতে নিষেধ করে।

ভাঙ্গড়ে ভাঙ্গড় শাহা ওয়াকেফ আছিল যাহা
বিবিকে তামাম বাতাইল।
বোন বিবি সেথা হইতে জঙ্গলীশাকে নিয়া সাথে
বাদা বনে দাখিল হইল ॥
প্রথমে জুড়িতে আইল আসন করিয়া নিল
নামাজ করিবারে।
আজান ফোকারে জঙ্গলী সেয়ছা পড়িল বিজলি
দক্ষিণারায় পাইল শুনিবারে

বজ্রনির্ঘোষে জঙ্গলী শাহার আজান ডাকে দক্ষিণারায় চঞ্চল হয়ে উঠে এবং বুঝতে পারে "আসিয়াছে দোছরা সে আর" তখন দক্ষিণারায় তার চেলাদের অনধিকার প্রবেশকারীদের ভাগাইয়া দিবার জন্য হুকুম জারি করে। 'ভাগাইয়া দেহ তাকে কোথা হতে এসে হাঁকে। নাহি জানে সীমানা আমার।' চেলাগণ হুকুম তামিল করতে গিয়ে বনবিবি আর জঙ্গলী শাহাকে দেখে ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করে এবং দক্ষিণারায়কে সংবাদ দেয়। "এক মর্দ্দ, এক বিবি, কি কব দোছরা ছবি, রূপে বন হয়েছে উজ্জ্বলা। বদনে মিলছে খাক, বন্দ করে দুই আঁখ। তছবি হাতে বলে আল্লা আল্লা।"

এই সংবাদ শুনে রায় সাহেব রাগে জ্বলে উঠে এবং মন্ত্রিকে ডেকে রণসজ্জা করতে আদেশ দেয়। কিন্তু দক্ষিণরায়ের মাতা রায়মণি

এই যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে পুত্রকে ডেকে সস্নেহে বলে—

"এসে বলে বেটা তুমি, লড়াইতে যাব আমি। আওরতের সাথে না লড়িবে। কপালেতে আছে যাহা, অবশ্য হইবে তাহা, হেরে আইলে অক্ষ্যাতি হইবে॥ তুমি কথা রাখ মেরা, মনে হাসি হবে তেরা, তুমি থাক আমি যুদ্ধে যাই॥"

বীর পুত্রের পক্ষে নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করা অমর্য্যাদাকর মনে করে মাতা রায়মণি বীরঙ্গনার বেশে বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করলো। যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা খুবই কৌতুককর, যথা—

রায়মণি সজ্জা করে　　দেওদানব সব ভাবে
যুদ্ধে যেতে রওনা হইল।
দেও হেন সাজে দূত　　কালো কালো যত ভূত
দেড় লক্ষ সোমার করিল॥
দেওগণ হাতে লাঠি　　কুহকি সাইত্রিশ কোটি
সেজে চলে মাথা এলো করি।
রায়মণি তা বাদেতে　　অস্ত্র সস্ত্র লিয়া হাতে
লড়িতে চলিল দম্ভ করি॥
রথে আরোহণ হইয়া　　যায় কড়া বাজাইয়া
মহাশব্দে জুড়ি মধ্যে গিয়া।
চারিতর কেতে ঘেরে　　কত লাফ কাক করে
বনবিবি দেখিতে পাইয়া॥

বনবিবি রায়মণিকে ভূতপ্রেত সহ কড়া বাজিয়ে যুদ্ধে আসতে দেখে ভাই জঙ্গলীকে সজোরে আজান ডাকার জন্য আদেশ করলো। তখন জঙ্গলী-শা জোরে আজান ডাকতে লাগলো। 'আজানের আওয়াজেতে, ভুত না পারে টিকিতে। দেও দানব সকলি ভাগিল. ভেগে যায় লাখে লাখ, মুখে নাহি সরে বাক, রায়মণি পড়ে ভাবনায়।' আর এদিকে বনবিবি "আশা এক হাতে লিয়া, তাতে দেওয়া ফুক দিয়া, ফেকিল আছমান তরফেতে। এছমের জালে

ঘুরে। যেমন ঝনঝনা গেরে, ডাকিনী সবার উপরেতে॥" এর ফলে যত ডাকিনী যোগিনী এনেছিল রায়মণি 'গেল সব লাহজায় মরিয়া।" রায়মণি বিপাক বুঝে দমলো না বরং নিজেকে মজবুত করে তৈরী হলো এবং ধনুকে কঠিন কঠিন বাণ প্রয়োগ করতে লাগলো।

"সটচক্র প্রথমেতে, গদাচক্র দ্বিতীয়াতে, তৃতীয়াতে ঘর চক্র বাণ।

তিন বাণ রায়মণি, ছাড়ে যেন ছোটে অগ্নি, বনবিবি হইল সাবধান।" ভীষণ বাণে বনবিবিকে জর্জরিত করার জন্য রায়মণি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু খোদার কৃপা বলে বলীয়সী বনবিবি কলেমা ডাকতে লাগলো এবং আশা সজোরে মারতে লাগলো। ফলে "রায়মণির তিন বাণ, হৈয়া গেল খান খান, আশার চোটে জমিনে গিরিল।" এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে যখন রায়মণির সমস্ত বান নিঃশেষ হয়ে গেল তখন রায়মণি রথ থেকে 'নামিল গোস্বায়ে।' আর হাতে এক ধারালো ছোরা নিয়ে বাঘিনীর মত বনবিবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং বনবিবির বক্ষস্থলে সজোরে ছুরিকাঘাত করলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বনবিবির বুকে ছুরিকা ফুলের মত ঘুরতে লাগলো। তাকে একটুও আঁচড় দিল না তখন "রায়মণি দেখে বলে একি অবতার, না লাগে বিবির গায়ে ছুরির আঘাত ফুল হইয়া ওড়ে॥" তবুও বাঘিনী রায়মণি দমবার নয়। আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বনবিবির উপর গোর্জ্জ মারতে লাগে। কিন্তু তাও আল্লার হুকুমে ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন কোন উপায় না দেখে মরিয়া হয়ে ছুটে এসে বনবিবির কোমর ধরে যুদ্ধ আরম্ভ করে।

"হাতাহাতি করে যেন মস্ত হাতি লড়ে, ভিড়ন হইল যেন পাহাড়ে পাহাড়ে। সারাদিন লড়ে দোহে কেহ না পারিল, বনবিবি দেলে তবে বিপাক জানিল।" এবার বনবিবি আর রায়মণির সঙ্গে পেরে উঠছে না। রায়মণি মনে হয় 'এবার বনবিবিরে ডালিবে মারিয়া।' তখন বনবিবি বরকতের স্মরণ করতে থাকে। বরকত জানতে পেয়ে খোদার হুকুমে এক দোওয়া বনবিবিকে দিল।

"বরকতের দোওয়াতে বনবিবি পাইল যে জোর। পাক দিয়া ধরে রায়মণির কোমর। উঠাইয়া ছের পরে জমিনে ডালিয়া, আল্লা নাম নিয়া বসে ছাতি দাবাইয়া।" আর চুলের মুঠি ধরে ছুরি গলায় বসিয়ে জবাই করতে যায়। আর রায়মণি বনবিবির হাতে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে সন্ধি করতে বাধ্য হলো।

"রায়মণি ডরে পাও ধরিল বিবির।
বলে মাপ করে দেহ আমার কছির ॥
জান বকসি কর মোরে না মারিবে আর।
বাদা হইবে এবে তোমার এক্তিয়ার ॥
আটার ভাটি তুমি মোক্তার হইলে।
রায়মণি পানা সঙ্গে সই সই বলে ॥
প্রাণ দান দেহ ভিক্ষা চাহি চরণেতে।
দাসী হয়ে রব তেরা আঠার ভাটিতে ॥
তুমি রাজা আমি প্রজা কহিনু একবার।
ফিরিল দোহাই তেরা হইনু তাবেদার ॥

এই কথা শুনে দয়ার ভাণ্ডার মা জননী বনবিবি রায়মণীর ছাতির উপর থেকে নেমে নিজের আসন গ্রহণ করলো এবং বনবাসী সকলকে ডাক দিল। তারা সকলে ভাটীশ্বরীর সম্মানার্থে নজরানা নিয়ে উপস্থিত হলো। চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। বনবিবি তখন সকলের সামনে বল্লো—

বনবিবি বলে সবে শোন বিবরণ।
বাটিয়া আটিয়া ভাটি লইব এখন ॥
কদাচ মনে কারো দুঃখ নাহি দিব।
সমান করিয়া বাদা কাটিয়া লইব ॥

কথামত বনবিবি কাহারো মনে দুঃখ না দিয়ে এক শান্তিপূর্ণ আঠার ভাটি রাজ্য শাসন করেন। এই মহত্বে বনের প্রধানগণ

খুবই সন্তুষ্ট হয়ে ভাটেশ্বরী বনবিবির আনুগত্য স্বীকার করে এবং সর্দ্দার বলে মান্য করতে অঙ্গীকার করে।

আছিল যতেক সেই বনের প্রধান।
বাটহুয়ারা কাটিয়া সঝোরে দিয়া দেন॥
যার যে সবহুদ্দ লিয়া খুসিতে বইল।
কেহ কারও সীমানা না হরণ করিল॥
বনবিবি সকলের সর্দ্দার হইল।

আরও জানা যায় যে বনবিবির দক্ষিণ সীমানা ছিল এড়োজোল, উত্তর সীমানা ছিল হাসনাবাদ।

দক্ষিণারায়কে কোদাখালি দিয়েছিল। আর নিজে বহুবাদা সৃষ্টি করেছিল। "করিয়া বাদার সৃষ্টি খুশিতে ভূষিত সোম মধু বনে পয়দা হইল বিপরীত।" এইভাবে বনবিবি সারা সুন্দরবনে বা বাদাবনে স্বীয় বাহুবলে ও সিদ্ধিবলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে সাম্য ও ন্যায়-নীতির সঙ্গে রাজত্ব করেছিল। কাহারও মনে দুঃখ দেয় নাই। এমনকি চরম শত্রু রায়মণির সঙ্গে যুদ্ধের পরে পরম মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে শত্রুমিত্র সকলের অন্তর জয় করেছিল এবং বহু পরিশ্রম করে দুর্গম বাদা বনে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যান্ত পরিভ্রমণ করে গ্রাম বসিয়েছিল এবং অর্থকরী সোম মধুর সন্ধান বের করেছিল। তাই এই মহাতান্ত্রিক সাধিকা হিন্দু-মুসলমানের কাছে অদ্যাবধি দেবতার ন্যায় পূজা পেয়ে আসছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে বনবিবির থান বা পূজার বেদী নির্মিত হয়েছে। জেলে কাঠুরিয়া, মধু আরোহণ-কারিগণ সকলেই বনে প্রবেশ করবার পূর্বে বনবিবির পূজা ক'রে তার বরাভয় কামনা করে। বনবিবির এই কাহিনীর সঙ্গে আর একটা উপন্যাস যুক্ত হয়ে আছে, সেটা উল্লেখ না করলে বনবিবির অপার করুণা ও মহিমার কথা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। তবে আলোচনা খুব দীর্ঘ না করে সংক্ষেপে দুঃখীরামের উপাখ্যানটি এইখানে বর্ণনা করছি। কারণ বনবিবির পূজা মণ্ডপে তিনটি মূর্তির পূজা হয় এক

সঙ্গে। মহিষাসুর মর্দিনী দুর্গাপূজায় যেরূপ দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুর, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক প্রভৃতি পূজিত হয়। ঠিক তেমনি বনবিবির কৃপায় বনবিবির সঙ্গে তার ভক্ত দুখীরাম ও রাক্ষসরূপী দক্ষিণারায় ও বনবিবির সঙ্গে পূজা পেয়ে থাকে। দক্ষিণারায়ের ও তার মাতা রায়মণির কথা প্রসঙ্গক্রমে আমরা আলোচনা করেছি। এখন দুখীরাম ও প্রসঙ্গক্রমে পীরগাজী ও দক্ষিণারায়ের আলোচনা করবো।

বরিজহাটিতে ধোনাই-মোনাই নামে দুইভাই বাস করতো। একদা ধোনাই বাদাবনে সাতডিঙ্গা নিয়ে মোমমধু এনে ব্যবসা করার জন্য প্রস্তুত হয়। তার ডিঙ্গার জন্য একটা লোকের অভাব পড়ে। তখন "ধোনাই খুঁজিতে লোক রওয়ানা হইল। সেই গ্রামে দুখে নামে গরীব এক ছিল, ধোনা মৌঝে তার বাড়ি পৌঁছিল যাইয়া। দুখে বলে ডাকে দরওয়াজায় খাড়া হৈয়া॥" কিন্তু দুখী তার মায়ের একমাত্র সন্তান। তার দুখীকে বাদাবনে বাঘের মুখে যেতে দিতে রাজী নয়। "মা বলিতে দুনিয়াতে আর কেহ নাই। বাঘের মল্লুকে তোরে কি রূপে পাঠাই।"

তখন ধোনাই দুখীরমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলো যে দুখীকে সে নিজের পুত্রের ন্যায় দেখবে। নৌকাতেই তাকে রাখবে। বাদায় তাকে উঠতে দিবে না। তাই ধোনাই বললো—"ধোনাই কহিল ভাবী না ভাব অধিক। দুখেকে দেখিব আমি বেটার মাফিক।"

তখন নিরুপায় হয়ে ধোনাইর হাতে ধরে অনেক অনুরোধ করে অনিচ্ছা সত্বেও ছেলের চাপে তাকে যেতে দিতে রাজী হলো, তবে যাবার সময়ে দুখের মা বলে দিল—"আপন বিপদে পড়িলে তোমার মনেতে রাখবে এই কথাটি আমার॥ জগৎজননী বনবিবি বনে থাকে। বিপদে পড়িলে তুমি ডাকিও তাহাকে॥ বিপদে পড়িলে তাকে ডাক মা বলিয়া। দয়ালু মা বনবিবি লিবে উদ্ধারিয়া॥" মাতার আশীর্বাদ নিয়ে দুখী ধোনাই এর সঙ্গে ডিঙ্গায় চলে গেল। ডিঙ্গা রায়মঙ্গল, মাতলা নদী পার হয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মোমমধুর অন্বেষণ করতে

করতে গড়খালির বাদাবনে গিয়ে নঙ্গর করে রাত্রি যাপন করলো। পরের দিন বাদাবনে গিয়ে বহু খোঁজাখুঁজি করেও একবিন্দু মধুর সন্ধান পেল না। "চাকের ভিতর নাহি মধুর ভাণ্ডার। লীলা খেলা হবে বুঝি কোন দেবতার॥ নজরেতে দেখি সহদের এর নাই। কাছে গেলে চাক খালি দেখিবারে পাই॥" তাই খুব হতাশ হয়ে ধোনাই রাত্রে ডিঙ্গায় ফিরে বিষম বদনে শুয়ে রইলো। তখন স্বপ্নে দক্ষিণারায় ধোনাইকে দেখা দিয়ে বল্লো—

"ধোনাকে দক্ষিণারায় কহিল তখন।
বাদাবনে মোম মধুর আমার সৃজন॥
দণ্ডবক্ষ দেড় ছিল পিতা সে আমার।
দক্ষিণ রায় নাম আমি তনয় তাহার॥

*　　*　　*　　*　　*

রায় বলে ওরে ধোনা কি বলিব আর।
নর রক্ত খেতে ওরে বাসনা আমার॥
এক লোক মোরে যদি দিতে পার তুমি।
মোম মধু সাত ডিঙ্গা দিব তোরে আমি।

এই নির্মম কথা শুনে ধোনাইর মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। কিন্তু এত অর্থব্যয় করে এবং এত দূরে সাত ডিঙ্গা নিয়ে এসে শূন্য হাতে ফিরে যাবে কি করে। এসব ভেবে যখন কিছু স্থির করতে পারছে না, উভয় সংকটে পড়ে হাবুডুবু করছে, তখন দক্ষিণারায় স্বপ্নে আবার বলছে যদি নররক্তে আমাকে তুষ্ট না কর তবে "তেরো নাও সব দিব ডুবাইয়া। যতলোক আনিয়াছ খাওয়াব কুমীরে। দেখি বেটা কেমনেতে যাও দেশে ফিরে॥" এই কথা শুনে ধোনাই-এর প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তখন "দক্ষিণ রায় বলে বেটা খুশি যদি চাহ। দুখকে আমারে দিয়ে মধু নিয়ে যাহ॥" একি কথা! ধোনার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। মনে পড়লো দুখের মায়ের কাছে তার প্রতিজ্ঞার কথা। তখন সে অন্য কাউকে

দিতে চাইলো। তখন আকাশ বাণী হ'লো ঃ—

দুখের উপরে মোর দৃষ্টি রায় বলে।
দুখে ছাড়া নাহি লিব অন্যকে সে দিলে॥
রায়ের এ বাতে ধোনা হইল পেরে-শান।
দুখেকে দিতেই হবে রাজী হইল নিদান॥"

তখন দক্ষিণা রায় সন্তুষ্ট হয়ে কেদোখালিতে দুখেকে দিবার জন্য আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কথা মত বনে গিয়ে এবারে প্রচুর মোমমধু পেয়ে সপ্ত ডিঙা ভর্তি করে ধোনাই মনের আনন্দে ডিঙা খুলে স্বস্থানে গমন করলো। কিছু দিন পরে ডিঙা কেদোখালিতে এসে নঙ্গর করে রাত্রিবাস করতে লাগলো। পরদিন প্রাতে ছয়খানি ডিঙ্গা আগে খুলে গেল। যে ডিঙ্গাতে দুখে ছিল সে ডিঙ্গা দেরী করতে লাগলো কাঠ সংগ্রহের জন্য। ধোনার আদেশে দুখেকে নিয়ে সকলে কাঠ কাটতে গেল। দুখে যেতে চায় না। তার মনে সন্দেহ হয়েছে। তাই বহু কাকুতি করলো। তার মার কথা ধোনাকে বললো—কিন্তু ধোনা কিছুতেই ধন গর্বে তার কাকুতিতে কর্ণপাত করলো না।

ধোনা বলে পাজি বেটা তসতাত বেটার।
একটা ফরমাস যদি মানিস আমার॥
ভালই চাওত জলদি কাট আন গিযা।
নাও হইতে কান ধরে দিব নামাইয়া।"

তখন বাধ্য হয়ে মনের দুঃখে দুখী বনে কাট কাটতে যায়। কিন্তু ধোনার ইসারায় দুখীকে ফেলে সকলে ডিঙায় উঠে ডিঙ্গা নিয়ে চলে আসে। কাঠ নিয়ে ফিরে এসে দুখী দেখে ডিঙ্গা নেই। তখন দুখী ধোনার কুমতলবের কথা বুঝতে পারে—'চরেতে বসিয়া কান্দে কাতর হইয়া'। নিমেষের মধ্যে দেখতে পেলো "প্রকাণ্ড শরীর আর দুম উর্দ্ধে তুলে, হাওয়া ভরে আসে বাঘ খেতে গাল মেলে"॥ তখন দুখীর প্রাণ দেহ ছাড়া হবার উপক্রম। ভয়ে-দুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

পড়ে। এই সময়ে হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে হতে থাকে।

তখন মনে প্রাণে বিপত্তারিণী জগতজননী বনবিবিকে দুখে কাতর ভাবে ডাকতে থাকে।

"বলে মাগো বনবিবি কোথায় আছ ছেড়ে।
এই সময় আইস গো মা দুখে মারা পড়ে॥

*　　*　　*　　*

এতেক বলিয়া তবে জ্ঞান হারাইল।
ভর কুণ্ডে থাকি বিবি জানিতে পারিল॥

ভক্তের ডাকে বনবিবি মুহূর্তের মধ্যে দুখের কাছে জঙ্গলী সাহাকে সঙ্গে নিয়ে এসে দেখে এক রাক্ষস দুখের ঘাড় মটকাতে উদ্যত। তখন জঙ্গলী শাহ বিবির নির্দেশে—"খুব জোরে চড মারে বাঘের মাথায়। নাসাকুল চড খেয়ে ফাফড় হইল। জান লিয়া দক্ষিণা দেও দক্ষিণে চলিল॥" বুলেটের ন্যায় চড খেয়ে রাক্ষসরূপী দক্ষিণা রায় প্রাণভয়ে নদনদী পেরিয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু জঙ্গলী ছাড়বার পাত্র নয়। সে তার পিছু পিছু তাড়া করতে থাকে। এদিকে বনবিবি দুখেকে উঠিয়ে "ধুলা শুদ্ধা কোলে নিল জগতের মাতা, বাছা বাছা বলে ডাকে নাহি কহে কথা॥" তখন তার মুখে জল দিয়ে, নানা ফুক দিয়ে, সেবা যত্ন দিয়ে তার জ্ঞান ফিরায়। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে বনবিবি তাকে নিয়ে যথাস্থানে ফিরে যায়। দুখে মনের আনন্দে জগতমাতার আশ্রয়ে দিন যাপন করতে থাকে।

"এদিকে ধোনা মৌলে মোম মধু ঘরেতে আনিল। তামাম শহরে তার খবর হইল।" আবার এও প্রচার করলো ধোনা যে দুখেকে বাঘে খেয়েছে। কিন্তু দুখের মা দুখে বাঘের পেটে গেছে শুনে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যেতে থাকে।

"এইরূপে কান্দে বুড়ি ফেরে বাড়িবাড়ি।
কানে কালা চক্ষু অন্ধ ক্ষীণ হইল নাড়ী।

পাগলের মত খানাপিনা না করে মাঠেঘাটে দুখের মা ঘুরে

বেড়ায় আর জগতজননী বনবিবির স্মরণ করে। 'অন্তর যামিনী মাতা, জানিতে পারিল এবং দুখের মাতার দুঃখে দুঃখিত হইল।' বনবিবি দুখেব মাতার শোচনীয় দুঃখের কথা জানতে পেরে দুখেকে তার মাতার কাছে পাঠাবার কথা ভাবলো।

"বিবি বলে যাহ বাবা ঘরে আপনার।
বুড়ি মাতা কান্দে তোর হয়ে জারে জার॥

কিন্তু দুখে কিছুতেই বনবিবিকে ছেড়ে আসতে চায় না। তখন "বনবিবি বলে বেটা করনা ভাবনা। আমি তোর পিঠ পরে আছি পোস্ত পানা। যখন ধিয়ান তুমি করিবে আমায় মুহূর্তে যাইয়া দেখা দেবই তোমায়॥" আর দুখে কোন আপত্তি করতে পারলো না। বনবিবির ব্যবস্থা মত সেকো নামে এক কুমীরের পীঠে চড়ে দুখে নিজ গ্রামে গিয়ে পৌঁছাল। "পৌঁছিল যখন গিয়া ঘরে আপনার। দেখে বুড়ি পড়ে আছে হইয়া লাচার॥ চক্ষে নাহি দেখে কানে না পায় শুনিতে, দেখে দুখে দর্দ্দ দেলে লাগিল কান্দিতে॥" মনের দুঃখে তখন দুখে বনবিবির স্মরণাপন্ন হলো। দুখের স্মরণমাত্র দয়াময়ী বনবিবি "ল্যাহজায়" দুখের কাছে এসে দেখা দিল। এবং তার মাকে মুহূর্তের মধ্যে দৈব প্রভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিয়ে অন্তর্ধান হলো। বুড়ির জ্ঞান ফিরতে বুড়ি ছেলে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। আর দুখের কাছে বনবিবির অপার করুণার কথা শুনে "বুড়ি বলে বাচাইল তোরে পাক জাত। বোনবিবির নামে ক্ষীব করহ খয়রাত॥" তখন বুড়ির কথামত সাতগ্রামে গলায় কুড়ালি বেধে ভিক্ষা করলো, আর সাতগ্রাম মাগিয়া দুখে যাহা পাইল—'চাল চিনি দুধ এনে ক্ষীর বানাইল।' এবং বনবিবির থান তৈরী করে পূজা দিয়ে গ্রামের লোককে প্রসাদ বিতরণ করলো। সেইদিন থেকে বনবিবির পূজা ও ক্ষীর ভোগ দেওয়া প্রথা শুরু হয়।

আর অপর দিকে দক্ষিণারায় ছুটতে ছুটতে ভাঙ্গড়ে গাজী পীরের কাছে গিয়ে বিপদের কথা জানালো, গাজীপীর সব শুনে—

"গাজী বলে দক্ষিণা তুমি না জান সন্ধান।
বনবিবি নাম তার ভাটির প্রধান॥
না বুঝিয়া ফাছাদ করিলে তার সাথে।
তোমাকে হয়রান করিবে হুর রাতে॥"

এইরূপ যখন কথাবার্তা হচ্ছে ঠিক সেই সময়—'সোটা হাতে লিয়া তথা শা-জঙ্গলী পৌঁছিল।' তখন দক্ষিণারায় গাজীপীরের পিছনে লুকিয়ে যায় এবং উভয় 'ছালাম আলেক' হয়। এবং দক্ষিণা-রায়কে তার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা করতে অনুরোধ করে। কিন্তু জঙ্গলী শা কিছুতেই রাজী নয়। তাই বলে 'মানুষ ধরিয়া খায় কাফের গাঙার, দেখাইয়া দিব মজা দেখিবে এবার॥ গাজীপীরের অনুরোধে সকলে মিলে বনবিবির কাছে মাপ চাইবার জন্য গেল।

"গাজী আর রায় গেল সাথে শা জঙ্গলীর।
যাইয়া হাজির হইল হুজুর বিবির॥

বনবিবি বহু ভর্ৎসনা করলো কারণ দরবেশ হয়ে এসে নররক্ত খাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু গাজী নাছোড়বান্দা। বনবিবির পায়ে ধরে মা মা বলে মিনতি করতে লাগলো। "মিনতি করাতে ছেলে রহম হইল। দক্ষিণ রায়ের গোনা মাফ করে দিল।" তবে দুখের দুঃখ লাঘবের জন্য গাজীপীর ও দক্ষিণারায়কে সর্বপ্রকার সাহায্য করার আদেশ দিলো।

"কহে বিবি এক বেটা দুখে ছিল মোর।
তার দুখেতে আমি আছিনু কাতর॥

তখন গাজী প্রতিশ্রুতি দিলো "সাতডালা ধন আমি দিই দুখেরে। কারার করিনু আমি তোমার হুজুরে॥"

তখন বনবিবি জিজ্ঞেস করলো দুখে এই সব ধন কি করে পাবে? গাজী বলে "পাবে দুখে ঘরেতে বসিয়া।" এই শুনে বিবির খুব আনন্দ হলো। তারপর দক্ষিণারায় কিভাবে দুখেকে সাহায্য করবে জিজ্ঞাসা করলো। তখন রায় বলে "দুখেকে আমি কি দিব ধন।

জঙ্গলেতে মোম-মধু আমার সৃজন॥ আঠার ভাটির মধ্যে এখন আমার। যখন চাহিবে দিব করিনু কারার॥ লিয়া যেতে হবে না দিব পোঁছাইয়া। অনায়াসে পাবে দুখে ঘরেতে বসিয়া॥" এইভাবে প্রতিজ্ঞা করে "ছালাম তছলিম" করে গাজী ও রায় বিদায় নিল। আর ডুরকুণ্ডে বিবি আপন আসনে বসে আনন্দ করতে লাগলো। দুখীরামকে স্বপ্নে বনবিবি জানালো দক্ষিণারায় ও গাজীপীরকে স্মরণ করলেই তারা দুখের দুঃখ লাঘবের জন্য সাহায্য করবে। দয়াময়ী জগৎজননী বনবিবির সপ্নাদেশ মত বডখান গাজীকে স্মরণ করা মাত্র সাত জালা মোহর তার বাড়ির তাল গাছের নীচে পেল। তারপরে দক্ষিণারায়কে স্মরণ করে "মাল মসলা কাষ্ঠ আদি" সব কিছু পেলো এবং তাই দিয়ে বিরাট ইমারত তৈরী করে এবং ধোনায়ের বাড়িতে বিয়ে করে পরম সুখে বাস করতে লাগলো। এবং খুব দয়ার সঙ্গে প্রজা পালন করতে লাগল। ক্রমে দুখের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

"দুখের রাজত্বে প্রজা থাকে আরামেতে।
বিনা খাজনায় বাস করে গরীবেতে॥
তাবেদার হইল ঘাতক জমীদার।
ফাজেল মৌলবী করেন বিচার॥

এই দুখী তখন বিরাট ভাটির মালিক হয়ে 'বোনবিবির নামে খুব দান খয়রাত করিল।' এইভাবে আঠার ভাটিতে বনবিবির পূজা ও ক্ষীর ভোগ দেওয়া প্রথা দুখী কর্তৃক প্রবর্তন ও প্রচার হলো। আমার মনে হয়—এই দুখীরামই বনবিবি পূজার প্রবর্তক। কাহিনী লিখেছেন ভুবসুট কানপুরের মোহাম্মদ মুনসী ১৩০৫ সালে বারই ফাল্গুন। পাঁচালীকারের ভনিতা থেকে এই কথা জানা যায়—

"তেরশ পাঁচ সাল বারই ফাল্গুনে।
কলম বিদায় করিলাম ভেবে শুণে॥
কহে মোহাম্মদ মুনসী জনাবে সবার।
ভুরসুট কানপুরে বসতি আমার॥

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করিলাম তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বনবিবি একজন যোগসিদ্ধা মুসলমান রমণী। নিজের বুদ্ধিবলে ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সুন্দরবনের বা বাদাবনের আঠারটি ভাটির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং জঙ্গলের সব পশুপক্ষী, এমনকি হিংস্র জন্তুকে মন্ত্রপুত বা আশা বাড়ির দ্বারা বশীভূত করেছিলেন। আশাবাড়ীকে আমরা যাদুদণ্ড (magic stand) বা বৈদ্যুতিক দণ্ডের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আর আজান ডাকের দ্বারা ভূতপ্রেত প্রভৃতিকে পরাভূত করেছিলেন। আবার বনবিবি বহু মহৎ গুণের অধিকারিণী। সাম্য ও ন্যায়-নীতির দ্বারা শাসন পরিচালনা করতেন। ক্ষমাপ্রার্থীকে সস্নেহে ক্ষমা করতেন। শরণাগত আর্তজনকে বিপদমুক্ত করতেন ও আশ্রয় দিতেন। তাই দেবীরূপে তার পুজা জাতিধর্মনির্বিশেষে এখন সকলেই করে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক গোপেন্দুকৃষ্ণ বসু মহাশয় কর্তৃক লিখিত বাংলার 'লৌকিক দেবতা' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য :—

"বনবিবির স্বরূপ সম্বন্ধে লোক-সংস্কৃতি বা লৌকিক দেবতা বিষয়ে গবেষক এবং তাঁর পুর্ব ধারণা আছে, তন্মধ্যের কয়েকটীর উল্লেখ করছি :—

১। ইনি হিন্দু দেবী বর্ণদুর্গা, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী। মুসলমান প্রাধান্য কালে বনবিবি হয়েছেন।

২। হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার সমন্বিত বা মিশ্রিত অরণ্য দেবী।

৩। ইনি আদি পাঠান যুগের কোন মুসলমানসাধিকা ও ইসলাম ধর্ম প্রচারিকা অভিজাত মহিলা ছিলেন, সে কারণে প্রথমে মুসলমান সমাজে বহুজন পুজ্য হন। পরে ভক্তির প্রাবল্যে দেবী পদে উন্নীত হন। এই দেবীর পূজার উৎপত্তি-কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগণা (বা দক্ষিণ খুলনা জেলা) অঞ্চলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকায় বা

সহাবস্থানের ফলে ঐ উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত হন—বর্তমানে ও তাইই আছেন।

*　　*　　*　　*

বনবিবি যে আদিতে বনদেবী তা বর্তমানেও এর মূর্তি ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে ধরা পড়ে। এখনও এঁর আকৃতি ও বেশভূষায় অরণ্য বৈশিষ্ট্য (sylvan characteristic) একেবারে লোপ পায় নি।

ইনি নানারূপ অলঙ্কার পরেন—শাড়ি-পিরাণ-পাজামা এমনকি জুতা মোজাও ব্যবহার করেন। কিন্তু শিরস্ত্রাণ টুপী বা মুকুটে ও গলায় বন্য লতাপাতা এখনও পল্লীর ছকথাবাদী গ্রাম্য পটুয়ারা চিত্রিত করে থাকেন।"

॥ ৩ ॥

দক্ষিণ রায়

বনবিবির পরে লৌকিক দেবতা হিসাবে সুন্দরবনবাসীর কাছে যে দেবতা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে তার নাম দক্ষিণ রায়। এই দেবতা সম্বন্ধে বহুরকম মতবাদ রয়েছে। বনবিবিকে যেমন কেউ কেউ বলেন হিন্দুর দেবতা, কেউ কেউ বলেন আদি পাঠান মুসলমান সাধিকা বা ইসলাম ধর্ম প্রচারিকা। সেরূপ দক্ষিণ রায়কে কেউ কেউ বলেন ইনি প্রতাপাদিত্যের বংশধর। কেউ কেউ বলেন, আদিম অরণ্যবাসীর কল্পিত দেবতা। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন মৌর্য-যুগের সমসাময়িক এই দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব। যাহোক্, অনেকের মতে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের শাসকদের দক্ষিণ রায় বলা হত। এখানে প্রশ্ন আসে তাহলে কি উত্তরাংশের শাসকদের উত্তর রায় বলা হত। আমার মনে হয় দক্ষিণ রায় প্রতাপাদিত্যের সেনানায়ক মদন রায়েরেই বংশধর। কারণ মদন রায়ই সুন্দরবনের প্রথম রাজা

উপাধি পায়। পূর্বে বনবিবির প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছি তার থেকে জানা যায় দক্ষিণ রায় দণ্ড রক্ষের পুত্র। মাতার নাম ছিল রায়মণি। পিতা খুব প্রতাপশালী ব্যক্তি। মাতা ছিল তান্ত্রিক সাধিকা ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণা। মল্লযুদ্ধেও খুব পারদর্শিনী। দণ্ড রক্ষের মৃত্যুর পর দক্ষিণ রায় এই দক্ষিণ সুন্দর বনের অধীশ্বর হয়। পুত্রের উপর তার মাতার প্রভাব খুবই প্রবল ছিল। মাতার প্রভাবে দক্ষিণ রায় তান্ত্রিক হয়ে ওঠে। দক্ষিণ রায় কর্তৃক দুখী রামের নর-রক্ত খাওয়ার যে কাহিনী পূর্বে বনবিবির জহুরা নামায় আলোকিত হয়েছে সেই কাহিনা থেকে এই সত্যে উদ্ভাসিত করতে পারি যে দক্ষিণ রায় একজন তান্ত্রিক সাধক হিসাবে দুখীরামকে নিয়ে তার রক্ত পান করতে চেয়েছিল তা নয়। তবে তাকে তার ইষ্টদেবতার কাছে হয়ত কাপালিকদের ন্যায় নরবলি দিয়ে আরো তান্ত্রিক সিদ্ধি লাভ করতে চেয়েছিলো। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের 'কপাল-কুণ্ডলা' উপন্যাসে কাপালিক কর্তৃক নবকুমার নামক, যুবাপুরুষের নরবলি দেওয়ার প্রচেষ্টার কথা এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ সুন্দরবনের দক্ষিণ অঞ্চলে যে তান্ত্রিক কাপালিকদের বিরাট আস্তানা ছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। ডাইনীরূপে নররক্ত পান করার কিংবদন্তী অনেক আছে। রায়মণিকে আমরা সেরূপ একজন বলে মনে করতে পারি। জনমানবহীন বাদাবনে এরূপ তান্ত্রিক সাধক-সাধিকা—যে বসবাস করত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তান্ত্রিকেরা মন্ত্রবলে হিংস্র জন্তু জানোয়ার-দের বশীভূত করতে পারত। সুতরাং তাদের পক্ষে নরখাদক হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ সুন্দরবন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করার কোন অসুবিধা ছিল না। বাহুবল এবং মন্ত্রশক্তির বলে তারা বলীয়ান ছিল। দক্ষিণ রায় অতি সুপুরুষ ছিল কারণ দক্ষিণ রায়ের যে মূর্ত্তি দেখা যায় তাতে আমার মনে হয় ইনি কার্ত্তিকের মত সুদর্শন ও স্বর্ণ কান্তিও বলবান পুরুষ। ইনি মোমমধু প্রভৃতি বনজ সম্পদের অধিকারী

ছিলেন এবং বাঘ-কুমীর প্রভৃতি হিংস্রজন্তু তাহার বশীভূত ছিল। দক্ষিণ রায়কে ব্যাঘ্রদেবতা রূপে পূজা করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এখানে আছে বলে আমার মনে হয়। দক্ষিণ রায়কে পূজা করলে বাঘের হাত থেকে বনে রক্ষা পাওয়া যায় বলে কাঠুরিয়া ও জেলেদের এই বদ্ধ ধারণা। নির্বিঘ্নে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করতে হলে ও পর্যাপ্ত পরিমাণ এই সমস্ত বনসম্পদ পেতে হলে দক্ষিণ রায়কে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। তাই সাড়ম্বরে তার পূজার আয়োজন! ধোনা মৌলের মত মোম-মধু পাওয়ার জন্য।

এখন হয়ত নরবলি মানত করতে হয় না। তবে এইসব বনদেবতা ও বনদেবীকে তুষ্ট রাখার জন্য অনেক সময় জোড়া জোড়া মোরগ বনে ছাড়ে। এর গভীর অর্থ এই যে বিশেষ বিশেষ স্থানে থানবাড়ী যেখানে যেখানে আছে সেখানে 'মোরগ' ছাড়লে বন্য কুক্কুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সহজে সবস্থানে খাদ্য পাওয়া গেলে বনের দক্ষিণ রায়রূপী হিংস্র নরখাদক জন্তুগুলি সেই সেইস্থানে থাকবে। অন্যান্য স্থানে তখন নির্বিঘ্নে কাঠ-মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করার সুবিধা হবে। সুতরাং এই পূজার প্রয়োজন আছে। এই পূজার মূল উদ্দেশ্য ধর্মের মাধ্যমে অর্থ লাভের পথ সুগম করা ও ব্যাঘ্রভীতি দূর করা। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের ভাষায়—"আদিম যুগে যখন সুন্দরবন ও অপর অরণ্যময় অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুর প্রতিবেশী ছিল, সে সময় তাদের একমাত্র ভয়ের কারণ ছিল ঐ পশুটি। দৈব উপায়ে তার গ্রাস হতে রক্ষা পাবার জন্যে ব্যাঘ্রের উদ্দেশ্যে বা কোন একটি সদাক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা পরায়ণ অশরীরী আত্মাকে ব্যাঘ্র কুলের অধিদেবতা কল্পনা করে তাকে নানারূপে প্রক্রিয়া দ্বারা তুষ্ট করে আর কৃপালাভের প্রয়াসী হয়, এইভাবে উক্ত অঞ্চলে ব্যাঘ্রপূজার প্রবর্তন ঘটে।" দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"মনে হয় মানুষ-দক্ষিণ রায় ঐ মধ্য যুগের এবং কোন এক পরবর্তী কালে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের পূজ্য ব্যাঘ্রদেবতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ব্যাঘ্রদেবতা

দক্ষিণ রায় বসে গেছেন। ব্যাঘ্রদেবতা আদি কালের ও দক্ষিণ রায় পরবর্তী সময়ের। কিন্তু তিনি মানুষ এবং ব্যাঘ্র হল পশু, তাই পদাধিকার বলে তার বাহন হয়ে গেছে। সেইকাল থেকে প্রচলিত মূর্তি অর্থাৎ ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণ রায়কে আজও আমরা দেখছি।"

॥ ৪ ॥

লৌকিক কাব্য রায়মঙ্গলের দক্ষিণ রায়

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কোন প্রথা সমাজের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যই রচিত হয়। যে ধর্ম, প্রথা বা সংস্কার মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনে অক্ষম তা অধর্ম, তা কুপ্রথা ও কুসংস্কার। লৌকিক দেবদেবীর সৃষ্টি ও পূজার দ্বারা মানুষের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধনের প্রচেষ্টা যে আছে তা অনস্বীকার্য। দুর্গা-দেবীর বাহন যেমন সিংহ, বনবিবির বাহনও তেমনি ব্যাঘ্ররূপে কল্পিত। এখানে বৈদিক দেবীর সঙ্গে লৌকিক দেবীর কল্পনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে দেবী দুর্গা দশভূজা এবং দশ প্রহরণ ধারিণী। কিন্তু বনবিবি ও নিরস্ত্রা নন, আশাবাড়ীই তাঁর প্রধান আয়ুধ। ইনি দ্বিভুজা পরে চতুর্ভুজা বা অষ্টভুজায় পরিণত হয়েছেন। এই ধারণা কাল-উপযোগী। পূজার বিধিব্যবস্থা একই। হিন্দুদের ব্রাহ্মণগণ বনবিবির পূজা করেন। আর মুসলমানদের ফকির পূজা করেন দক্ষিণ রায়ের বাহনও ব্যাঘ্র। কারণ ইনিই ব্যাঘ্রদেবতা। সমস্ত ব্যাঘ্রকুল এঁরই অধীন ছিল। পৃথকভাবে অথবা বনবিবির সঙ্গেই উনি পূজা পেয়ে থাকেন। বনবিবি পরে দক্ষিণ রায়কে পুত্রের ন্যায় ভালবাসতেন। ১২৭৯ সালে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডীযুগের ভাষা" প্রবন্ধে ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "মুসলমানেরা

পাঁচশত পঞ্চাশৎ বৎসর এই বঙ্গে একাধিপত্য করিয়াছেন। ধর্মে মাণিকপীর, সত্যপীর, ওলাবিবি, বনবিবি চালাইয়াছেন। ধর্মসংস্কারে দশ সংস্কারের উপর সমাধি সংস্কার চালাইয়াছেন। কুবিশ্বাসে মামদোভূতকে প্রত্যেক কবর স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন।.........
বাঙ্গালী দেহের উপরার্দ্ধের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন। আহার-পদ্ধতির উন্নতির শিক্ষা দিয়াছেন সমস্ত ভূভাগের বন্দোবস্ত সিদ্ধ মতে প্রচার করিয়াছেন। আয়-ব্যয় নিরূপণ-পদ্ধতি নিজ মতে প্রচার করিয়াছেন......। বাঙ্গলা ভাষার রীতি যবন শাসনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি কি গভীর ভাবে মুসলমান সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এমন কি ভাষা বাঙ্গালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতিহাস খুঁজলে জানা যায় যে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী বঙ্গ বিজয় করে বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির বিপর্যয়ের পর মুসলমান শাসনের অবসান হয়। সুতরাং এই দীর্ঘ ৫৫৪ বৎসরের প্রভাব বঙ্গবাসীর উপর খুব ব্যাপক ছিল যাতে করে বাঙালীর আচার-ব্যবহার খাদ্যাভ্যাস ধর্মকর্ম সবই ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বিশেষ করে কিছু কিছু মুসলমান সম্রাট ও শাসকগণ হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। হোসেন শাহ, আকবর প্রভৃতি শাসক ও সম্রাটগণের নাম তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হোসেন শাহ সত্যপীর নামে এক দেবতার পূজা প্রচলন করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং লৌকিক দেবদেবিগণ কোন বৈদিক বা পৌরাণিক দেবদেবী নয়। এরা পল্লীবাংলার গ্রামে-গঞ্জে বট অশ্বত্থ নিম বা বেল বকুল বৃক্ষের তলায় গ্রাম্য বধূদের কর্তৃক মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ভক্তিপূজা পেত। নিম্নশ্রেণী আর্যেতর সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের পূজা করত। পরে এরা সংস্কৃত মন্ত্রযুক্ত পূজা আদায় করেছে ব্রাহ্মণদের কাছে।

এদের মহিমা বাড়িয়ে দিয়েছেন মঙ্গলকাব্যের খ্যাতিমান কবিবৃন্দ। এঁরা বিভিন্ন ছড়া, ব্রতকথা বা পাঁচালী থেকে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে যখন বৃহদাকার মঙ্গলকাব্য রচনা করে মানব-সমাজের কল্যাণ বা মঙ্গল করার উদ্যোগ দেখিয়েছেন তখন সেই দেবদেবীরা সর্বজনপূজ্য হয়ে উঠেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও মহিমা প্রচারিত হয়েছে, সেই দেবদেবীর ভক্তগণ সেই দেবদেবিগণের দ্বারা বিপদ হতে মুক্ত হয়ে সেই দেবদেবী-পূজার্অর্চনা করে বহু ভূসম্পদের অধিকারী হয়েছে। তাই তাঁদের পূজা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আপদ-বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, শীতলা, বনবিবি ওলাবিবি, দক্ষিণ রায়, কালু রায় প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর আবির্ভাব। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবীদের নিয়ে যেমন মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে তেমনি দক্ষিণ রায়, কালু রায়, বনবিবি প্রভৃতিকে নিয়ে উপমঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। শক্তিধর কবিদের হাতে অনেক পাঁচালী মঙ্গলকাব্যে পরিগণিত হয়েছে। পঞ্চাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের যুগ বলা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন মধ্য শ্রেণীর কবি কৃষ্ণরাম দাস বাঘের রাজা দক্ষিণ রায়ের কাহিনী অবলম্বন করে একটি মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। এই কাব্য গুণের দিক থেকে বিচার করলে একে উপমঙ্গলকাব্য বলা সমীচীন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে রায়মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন। কৃষ্ণরামের "রায়মঙ্গল" হল ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণ রায় বা দক্ষিণের রায়ের মহিমাবিষয়ক কাব্য। কাব্যটি ১৬০৮ শক বা ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ব্যাঘ্র অধ্যুষিত নিম্নবঙ্গের বাঘের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনসাধারণ দক্ষিণ রায় (বা দক্ষিণের রায় অর্থাৎ দক্ষিণবাংলার রাজা) দেবতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য বাংলার বাইরেও উচ্চতর সমাজে ব্যাঘ্রদেবতার

পূজা এখনো প্রচলিত আছে। এই ব্যাঘ্রদেবতা অঞ্চল বিশেষে নানা নামে পরিচিত। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের দেবতার নাম দক্ষিণ রায়। মুসলমান প্রধান অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা বড় খাঁ গাজী নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও ব্যাঘ্রদেবতাকে বলে সোনা রায়। মুসলমান সমাজে ইনি পীর সোনা রায় নামে পরিচিত। এঁরা নিজেরা বাঘ নয়। বাঘের পিঠে চড়ে এঁরা পরিভ্রমণ করেন। সমস্ত ব্যাঘ্রসমাজ এঁদের বশংবদ। বাংলাদেশে দক্ষিণ রায়ের পাঁচালী বা রায়মঙ্গলে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জমিদারের ঝগড়া-ঝাঁটি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং স্থানীয় ঘটনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। প্রচলিত রায়মঙ্গলের দুটি আখ্যান—

একটি হল কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত ধনপতি সদাগরের কাহিনীর অনুকরণে বণিক পুষ্প দত্তের কাহিনী, আর একটি হচ্ছে হিন্দুর বাঘদেবতা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে মুসলমান বাঘ পীর বড়খাঁ গাজীর সংঘর্ষের গল্প। এই শেষোক্ত আখ্যানে দুই ব্যাঘ্রনেতা দক্ষিণ রায় (হিন্দু) বড়খাঁ গাজীর (মুসলমান) ভয়াবহ সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দুজনের দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্টি যখন যায় যায় হল, তখন স্বয়ং নারায়ণ একদেহে হিন্দু ও মুসলমানী বেশ পরিধান করে দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর বিরোধ মিটিয়ে ছিলেন। বলাই বাহুল্য, এই সমস্ত কাহিনীর পশ্চাতে উপদ্রুত হিন্দু জমিদার ও হিন্দু-সমাজ এবং উপদ্রবকারী মুসলমান জমিদারের বাস্তব সংঘর্ষের কাহিনী স্থান পেয়েছে। কবি কৃষ্ণরামের আগেও কেউ কেউ বোধ হয় এই বিষয়ে, অকিঞ্চিৎকর পাঁচালী লিখেছেন। কিন্তু কৃষ্ণরায়ের রায়মঙ্গলই কিঞ্চিৎ প্রতিভার পরিচায়ক। আমরা কৃষ্ণরাম দাসের কবিপ্রতিভা বিচারে নিযুক্ত নই, তাই এ সমন্ধে কোন মন্তব্য থেকে বিরত থাকছি। তবে এই উপমঙ্গল বা মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা থেকে দক্ষিণ রায় সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাচ্ছি এবং তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাচ্ছি। এর থেকে বুঝতে

পরেছি যে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ রায়ের কাহিনী লেখা কবি কৃষ্ণরাম দাস শেষ করেছেন। সুতরাং এই কাহিনী সমসাময়িক বা কিছু পূর্ববর্তী। এই লৌকিক দেবতার আবির্ভাবকাল এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত দেবদেবীর আবির্ভাবকাল, সপ্তদশ শতকের মধ্যে বলে ধরতে পারি। কবির নিবাস ছিল কলিকাতার অদূরে নিমতা গ্রামে। পিতার নাম ভগবতী দাস। জাতিতে কায়স্থ। শায়েস্তা খাঁ তখন বাংলার সুবাদার। এখন আমরা সুবিখ্যাত মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস প্রণেতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করলে দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রায়মঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা বলিয়া একজন দেবতাকে কল্পনা করা হইয়া থাকে। তাঁহার নাম দক্ষিণ রায়।

বাংলার দক্ষিণ দিকের দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রের বাসভূমি সুন্দরবন অবস্থিত। সেইজন্যই ইহার দেবতাকেও দক্ষিণ দিকের অধিকারী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়া থাকে। কোন কোন পাঁচালীকার অনুমান করেন দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন। তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুমীর ধনুর্বাণ দ্বারা শিকার করেন। তাঁহার চরিত্রটাই দেবত্বে পরিণত হয়। এই দক্ষিণ রায় নাকি যশোহর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন। রায় দক্ষিণ বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল "ভাটিশ্বর বা আঠার ভাটি বা বিভাগের অধীশ্বর"। তারপর তিনি মন্তব্য করেন —"দক্ষিণ রায় বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা। সংস্কৃত পুরাণাদিতে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতাগণের মধ্যে তিনি অন্যতম পুরুষচরিত্র।" পরে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ধনুর্ধারী দিব্যকান্তি ব্যাঘ্রাসীন এই দেবতার পরিকল্পনার মধ্যে মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনা আদিম প্রান্ত-

রোপাসক সামাজের দেবকল্পনা থেকে অনেক উন্নত। সুতরাং এর উদ্ভব অনেক পরবর্তী যুগের এবং পৌরাণিক প্রভাব যুক্ত। পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য দেবার জন্য রায়মঙ্গলের কবিগণ পরবর্তীকালে বহু অলৌকিক কাহিনী দক্ষিণ রায়ের চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন বলে আমার মনে হয়। এখন দক্ষিণ রায়ের কোন পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পাওয়া যায় না। মৃন্ময় মূর্তি কেবল পূজিত। এ বিষয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যেটি রায়-মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। যখন বড় গাজী খাঁ ও দক্ষিণ রায়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে তখন স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়ে যে সন্ধি করে দিয়েছিলেন তার শর্ত ছিল সমস্ত ভাটি অঞ্চল দক্ষিণ রায়ের অধিকারে থাকবে। কালু রায় হিজলীর অধীশ্বর থাকবে। বড় খাঁ গাজী সর্বত্র সম্মান লাভ করবে আর বড় গাজী খাঁর সমাধিতে ঐ দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড সর্বত্র পূজিত হবে। সেসময় থেকেই বড় গাজি খাঁর সমাধির প্রতীক মৃত্তিকাবেদি ও দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডের প্রতীক একটি মৃন্মুণ্ড একত্র পূজিত হয়। পুষ্প দত্ত বাদাবনে বাণিজ্য করতে গিয়ে উভয়ের পুজা এক স্থানে দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান জমিদার নেতাদের এই যুদ্ধে কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে সকলের অনুমান।

কবি কৃষ্ণরাম তাঁর রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ রায়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপিঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়॥

সদাগর কর্তৃক দক্ষিণ রায়ের যে স্তব আছে তাতেও দক্ষিণ রায়ের মনোমুগ্ধকর সুন্দর চেহারার বর্ণনা দেখা যায়। যথা—

স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর।
ভকতবৎসল তুমি গুণের সাগর॥

অপরাধ ক্ষমা কর বলি যোড়পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি ॥
ইন্দু হেন বদন মদনজিনি রূপ।
তোমা বিনা দক্ষিণে কেবা আছে ভূপ ॥

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে মোটামুটি জানা যায় তীরধনুহাতে বাঘের পিঠে আরোহিত ইন্দুসদৃশ দিব্যকান্তিযুক্ত মদন সদৃশ রূপবান সুপুরুষের চেহারাবিশিষ্ট পুরুষই দক্ষিণ রায়। কিন্তু ২৪ পরগনার ধপধাপি গ্রামে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের মূর্তি দেখা যায়—দক্ষিণ রায় বন্দুকধারী এক বিশালকায় পুরুষ। এই মূর্তিটি আমার মনে হয় অনেক পরবর্তী যুগের আধুনিক বন্দুকধারী শিকারীমূর্তির অনুসরণে নির্মিত হতে পারে। এই দেবতাকে স্থানীয় লোকেরা 'বাবা ঠাকুর' বলে। পৌষসংক্রান্তিতে ধপধাপি অঞ্চলে এক জোড়া কাটা মুণ্ডের পূজা দীর্ঘ দিন থেকে প্রচলিত আছে।

অনেকের ধারণা মুণ্ডমূর্তি দক্ষিণ রায়ের কাটামুণ্ড। আবার অনেকের ধারণা এই মুণ্ড গণেশের কাটা মুণ্ড। যাহোক, ব্যাঘ্রদেবতা হিসাবে দক্ষিণ রায়ের পূজা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই অদ্যাবধি বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে করে আসছে। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের প্রথম রাজা মদন দত্তরায়ের বংশধর। কারণ মদন দত্ত প্রতাপাদিত্যের ঢালীবাহিনীর সেনানায়ক ও মাতলা নদীর নৌ-বহরের অধ্যক্ষ ছিলেন। নৌবিশারদ হিসাবে তিনি সমগ্র সুন্দরবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর বংশধরগণ এখানে কিছুকাল রাজত্ব করতে থাকে।

যাহোক, কৃষ্ণরামের পরই হরিদেবের 'রায়মঙ্গল কাব্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি কাজ নিয়েই যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে বর্তমান কালে। ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' এবং

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল হরিদেব রচিত 'রায়মঙ্গলের' উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন। দুই কবির রচনার মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণরাম দক্ষিণ রায়কে মানুষ বা দক্ষিণ দেশের ভূপ বলেছেন কিন্তু হরিদেব দক্ষিণ রায়কে একেবারে পৌরাণিক দেবতারূপেই বর্ণনা করেছেন। হরিদেবের মতে দক্ষিণ রায় শিবের কামজপুত্র। তিনি তাকে গণেশ বলেও উল্লেখ করেছেন, মুণ্ড-প্রতীক বা বাবা-মূর্তির কথাও তাঁর কাব্যে উল্লেখ আছে। বাবা-মূর্তি অর্থে ঘটসহ মুণ্ডমূর্তি বুঝায়। পুনরায় হরি দেব দক্ষিণ রায়কে ক্ষেত্রপাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

আমি শুয়্যা থাকি টঙ্গে ক্ষেত্রপাল মনরঙ্গে
মোরে দেখা দিল ততক্ষণ।

দক্ষিণ রায় দ্রাবিড় সংস্কৃতির দান বলে অনেকের অনুমান। কবি হরিদেরের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'ঝরাঝারা' উল্লেখ দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার ধর্মসংস্কৃতির সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে।

যথা—অপরূপ ঝারা ঝারা দেখি ন্যায়াগণ,
যত্ন করি তুলিয়া আনিল ততক্ষণ॥

দক্ষিণ রায়ের স্বগতোক্তি থেকেও তা জানা যায়—

আমি ত মঙ্গল রাজা দক্ষিণ ঈশ্বর।
আমার সেবক বটে হরত ধীবর॥

উপরোক্ত দুইজন হিন্দু কবি ছাড়াও কতিপয় মুসলমানী কাব্যে বা কেচ্ছায় দক্ষিণ রায়ের উল্লেখ আছে। 'বনবিবির জহুরা নামা, আর কালুগাজীর গোবদীন নামক কেচ্ছা দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে মুসলমান কবিদের বর্ণনায় দক্ষিণ রায়ের প্রধান্যকে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে হীন প্রতিপন্ন করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে। সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য সৃষ্টি করা মুসলমানদের স্বাভাবিক মানসিকতা বা প্রবণতা বলা যায়। এই মনোভাবই তাদের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই লৌকিক দেবতার পূজা বঙ্গসংস্কৃতি বা সুন্দরবন সংস্কৃতির একটি বিরাট অধ্যায় জুড়ে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে প্রখ্যাত মনীষী বিনয় ঘোষ। তাঁর ভাষায়—'দক্ষিণের কথা দক্ষিণ রায়কে বাদ দিয়ে বলা যায় না, বলা সঙ্গতও নয়।—দক্ষিণ বঙ্গের 'দক্ষিণ রায়' মানুষ নন, দেবতা এবং শুধু দেবতা নন, বাঘের দেবতা। বাঘের দেবতা অর্থে ব্যাঘ্ররূপী দেবতা নন। বাঘের উপর আধিপত্য যাঁর বেশি, তিনিই বাঘের দেবতারূপে কল্পিত 'দক্ষিণ রায়।' প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীসুধাংশু রায় একটি অভিনব তথ্য উদ্ঘাটিত করে বলেছেন—'ভারতে মৌর্য রাজত্বের বহু পূর্বে বাংলা দেশে মিশরীয় আধিপত্য ছিল। বাংলা দেশের দু'টি অংশে দু'জন মিশরীয় শাসক রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এই শাসকদ্বয় কালক্রমে দেবায়িত হন। উত্তর অংশের শাসক সোনা রায় এবং দক্ষিণাংশের শাসক দক্ষিণ রায় রূপে পরিচিত হন। মিশরীয় শাসন অবসানের পরেও দুইজন রায় অদ্যাবধি পূজিত হচ্ছেন।

॥ ৫ ॥

রায়বংশের ইতিবৃত্ত

আদিগঙ্গার নিকটবর্তী জঙ্গল সাফাই করে গড়ঘেরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন মদন দত্ত। এই মদনদত্ত স্বহস্তে একাকী ভল্লুক বধ করে প্রতাপাদিত্যের নিকট থেকে মল্ল উপাধি লাভ করেন। এই তথ্য আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। ইনি পরে 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজেকে দক্ষিণ অঞ্চলের রাজা বলে ঘোষণা করেন। এর সঙ্গে মোবারক গাজী খাঁর মিত্রতা ছিল। কারণ মোবারক গাজী খাঁ একবার মধ্যস্থতা করে মদন রায়ের খাজনা বাকির মীমাংসা করে দেন। এই মধ্যস্থতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য মদন রায়

মোবারক গাজী খাঁর একটি মসজিদ বাঁশড়ার জঙ্গলে নির্মাণ করে দেন এবং জঙ্গল হাসিল করে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়ে দেন এবং কয়েক শত বিঘা জমি তার তত্ত্বাবধানের জন্য দান করেন। ১৭ই শ্রাবণ প্রতি বছর এই স্থানে অর্থাৎ ঘুটিয়ারী শরিফে ধর্মসম্মেলন হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বহু মৌলভী ও ফকির এখানে জমায়েৎ হন। ক্যানিং থেকে ট্রেন পথে গেলে ঘুটিয়ারী স্টেশন পড়ে। অম্বুবাচীর সময় পীরের ফতেয়া উৎসব হয়। পীরের উদ্দেশ্যে শিরণি, মোমবাতি, গোলাপ জল উৎসর্গ করা হয়। এই ফতেয়া উৎসবে বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের শিরণি প্রথম গৃহীত হয়। এই প্রথার অর্থ এই যে বারুইপুরের রায়েরা মদন রায়ের বংশধর। বংশপরম্পরায় এই প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে। শ্রীঅসিত রায়চৌধুরী মহাশয় এই তথ্য তাঁর 'বঙ্গসংস্কৃতি-কথা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ঢাকার নবাব দরবার থেকে মদন রায়ের বংশধরগণ রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেছেন। বাঁশড়ার গাজীর গানে মদন রায়ের উল্লেখ আছে। ২৪ পরগনা জেলার ২৪টি পরগনার মধ্যে একটি পরগনার নাম 'মদন মল'। মীরজাফর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৭৫৭ সালে ২০শে ডিসেম্বর যখন কলকাতার জমিদারী প্রদান করেছিল তখন এই 'মদনমল' নামের উল্লেখ আছে। কুলপীর কাছাকাছি গাজীর থানবাড়ী আছে। এই গ্রামের নামও হয়েছে গাজীপুর। ডায়মণ্ডহারবারকে এখনও অনেকে হাজীপুর বলে। এখানে হাজী পীরের থান আছে। মুসলমান আমলে বহু পীর-ফকির এসে গ্রামে গ্রামে আস্তানা গড়তো। সেইজন্য বিশেষ বিশেষ পীর-ফকিরের নামে গ্রামের নাম হয়েছে। যাহোক, দক্ষিণরায়ের এখন আবির্ভাবকাল মোটামুটি স্থির করতে পারি। গাজী মোবারকই সুন্দরবন অঞ্চলে বড়খাঁ গাজী নামে প্রাসদ্ধ হয়েছে। বড়খাঁ গাজীর সঙ্গে বনবিবির ও দক্ষিণ রায়ের পরিচয় ছিল। সুতরাং মদন রায় যদি প্রতাপাদিত্যের সেনানায়ক হন এবং আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ যখন প্রতাপ রায় বা

প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন তখনই মদন রায় ২৪ পরগনার অরণ্যময় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল। আর এই ঘটনা ঘটে ১৫৭৬ থেকে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তাহলে দক্ষিণ রায় মদন রায়ের বংশধর হিসাবে ষোড়শ শতকের শেষভাগে বা সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে সুন্দরবনে রাজত্ব করতো বলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। তবে নির্দিষ্ট সময় এখনও সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

বনবিবির কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। বনবিবির জহুরা নামাই বনবিবির কাহিনীর একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে এই জহুরানামা—রায়মঙ্গলের কাহিনীর মুসলমান সংস্করণ মাত্র। তাঁর ভাষায় "নিম্নবঙ্গের বিশেষতঃ ২৪ পরগনা জেলার মুসলমান সমাজে প্রায় রায়মঙ্গলের অনুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্ভবত উভয়ের মূল এক। মুন্সী বয়নদ্দীন সাহেব রচিত "বনবিবি জহুরানামা" নামক একখানি কাব্যে হিন্দু-সমাজের কল্পিত দক্ষিণ রায় ও মুসলমান সমাজের কল্পিত বনবিবির একটি মিশ্র কাহিনী পাওয়া যায়। ইহাই রায়মঙ্গলের কাহিনীর মুসলমান সংস্করণ।"

ডঃ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে "দক্ষিণ রায়ের মত আর একজন লৌকিক ব্যাঘ্রদেবতা আছেন। তাঁর নাম কালু রায়। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে এঁর পূজা প্রচলিত আছে।" 'কালু রায়ের গীত' নামে একটি সংক্ষিপ্ত পাঁচালীও আছে বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ নিত্যানন্দ কর্তৃক এই গীত লিখিত। কিন্তু ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে কালু রায় কুমীরের দেবতা। কালুরায়ের কথা আমরা পরে আলোচনা করবো।

॥ ৬ ॥

বড় গাজী খাঁ

এখন আমরা বড় গাজী খাঁ-এর বিষয় আলোচনা করবো। এঁরা কিন্তু কেউ কল্পিত দেবতা নন। এঁরা সবাই ঐতিহাসিক পুরুষ ও নারী। অপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতাবলে দেবতুল্য হয়েছেন। যেমন রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি যাঁরা একদা ঐতিহাসিক পুরুষ ও নারী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতার জন্য হিন্দুসমাজে দেবতার ন্যায় পূজিত হচ্ছেন। ঠিক সেরূপ সুন্দরবনের লৌকিক দেবদেবিগণ এখন পূজিত হচ্ছেন। তবে এঁরা সর্বজনীন দেবদেবী,সর্বজনের অতি শ্রদ্ধেয়; শুধু হিন্দু নয়, শতশত মুসলমানগণের দ্বারাও এই সব দেবদেবী পূজিত। এখানে এই লৌকিক দেবদেবী পৌরাণিক দেবদেবী অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা ও ভক্তির অধিকারী। কালক্রমে এঁরাই হয়ত সমগ্র ভারতে পূজ্য হয়ে উঠবেন। এমনও হতে পারে এই সব দেবতা যুগবিবর্তনের ফলে বহির্ভারতেও পূজিত হতে পারেন। মুসলমান-গরিষ্ঠ এলাকায় এই সব দেবদেবীর পূজার প্রচার হলেও হতে পারে।

যাহোক, বনবিবি এবং দক্ষিণ রায়এর সঙ্গে আর একজন লৌকিক দেবতা যিনি হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নিকট পূজা পাচ্ছেন, তাঁর নাম পীর মোবারক গাজী বা বড় গাজী খাঁ। গাজী শব্দের অর্থ যিনি ধর্মযুদ্ধে জয়ী তিনি গাজী আর 'হাজী' শব্দের অর্থ যিনি হর্জ্জ হতে ফিরেছেন বা মক্কাফেরত ফকির। বড় গাজী খাঁ কোন বিধর্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হননি বটে কিন্তু বিধর্মীদের ও অত্যাচারীদের হাত থেকে সুন্দরবনবাসীকে মুক্ত করে হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে পূজা পাচ্ছেন তিনি। যখন এই সুন্দরবনে পদার্পণ

করেন তখন সুন্দরবনবাসীর খুব দুর্দিন। প্রতাপাদিত্যের শাসন উত্তীর্ণ।

দিল্লীর তখত-তাউসে তখন হিন্দুবিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব আর বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ। তখন বাংলার রাজধানী ঢাকা। সুন্দরবন থেকে বহুদূর। এই দুর্গম স্থান যোগাযোগে বিচ্ছিন্ন। এই সুযোগ নিয়ে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণ উপকূলবর্তী স্থানে নির্মম অত্যাচার, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, এমনকি নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের দ্বারা সুন্দরবনবাসীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল এবং বহু জনপদকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। ১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই দুরবস্থা চলতে থাকে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এর উল্লেখ দেখা যায়, 'ধনপতির কালিদহে গমন' অংশে সুন্দরবনের বহু স্থান যে ফিরিঙ্গিদের অধিকারে ছিল এবং সেখানে যে অত্যাচার হতো তা নিম্ন বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। নাবিকেরা তাই ভয়ে এই স্থান পার হয়। যথা—

দক্ষিণে মেদিনী মল্ল বাসে বীর থানা।
কেরোয়ালে ঝমঝাম নদী জুড়ে ফেনা ॥
কলাহাটী ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের ঘাট বামদিকে থুইয়া ॥
ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বহিয়া যায় হারামদের ডরে ॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে ॥

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলের' রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও এটি যে ১৫৪৪ থেকে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকা যায়।

অনেকের মতে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে এর রচনা শেষ হয়। বাংলার অধিকাংশ স্থান যে তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং মানুষ অরণ্যচারী ও

বন্যজন্তুর সহিত সংগ্রাম করে জীবন যাপন করতো, দেশে অত্যাচার আর অনাচার যে ছিল তা নিম্ন বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। যথা—

বড়নাম বড়গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বাঁরের গোচর॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত দুটি আপনার বৈরী॥

জেন্দাপীরের কেচ্ছায়ও অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়—

নামাজ পড়িয়া খোসাল হইয়া যায় ছাদের উপর
ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া ধারে চৌদিকে করেন নজর।
ময়দানে চায়, দেখিবারে পায় উঠিতেছে যে আগুন॥

এই কেচ্ছা থেকে জানা যায়, মোবারক গাজির পিতার নাম চন্দন শাহ। ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত শাঁক শহর গ্রামে বাবন মোল্লার বাড়ীতে থাকতেন। পরে বেলের জঙ্গলে বাস করতেন। পিতার মৃত্যুর পর বাবন মোল্লার উদ্যোগে তাঁব সাদী হয়। কিন্তু তাঁর সংসারে মন ধরে না। তাই সংসার ছেড়ে সুন্দরবনের বহুস্থানে ঘুরে ঘুরে আর্ত ও হিংস্র জন্তুর কবলগ্রস্ত মানুষের উদ্ধারের পথ খুঁজতে থাকেন। একদা তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, এবং মন্ত্রবলে বাঘের মুখ বন্ধ করা শিক্ষা করেন। এই ভাবে জেলে, কাঠুরিয়া প্রভৃতি যারা সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে যেতো মাছ ধরতে বা কাঠ কাটতে তাদের বাঘের হাত থেকে রক্ষা করতেন। তিনি কাঠুরিয়াদের বা মধু সংগ্রহকারীদের সঙ্গে গিয়ে গণ্ডি দিয়ে মন্ত্র পড়তেন এবং বেদী নির্মাণ করতেন। যার ফলে বাঘ গণ্ডির ভিতরে আসতে পারতো না। তারা নির্বিঘ্নে কাঠ কাটতো বা মধু সংগ্রহ করতো, এ ছাড়া ব্যাধি মুক্ত করার জন্য বহু রকম ওষধ দিতেন। এতে বহু লোক উপকৃত হয়ে তাঁর গুণগান করতে লাগলো। সব চেয়ে তাঁর বড কীর্তি ঘটে ঘুটিয়ারীতে, এখানে তাঁর দেহাবসান হয়। মুসলমানী কেচ্ছায় নিম্নরূপ বর্ণনা দেখা যায়। মদন রায়ের খাজনা মকুব করিয়ে দিয়ে মদন রায়কে চিরানুগৃহীত

করে রাখেন। মদন রায় কর্তৃক শিরণি জলে ভাসানো প্রথা এখনো চলে আসছে এই ঘুটিয়ারী শরিফে। তার রহস্যজনক তিরোধানের জন্য মদনমল পেঁচাকালী প্রভৃতি পরগনাগুলিতে গাজী খাঁর বহু থান দেখা যায়। তাঁর তিরোধান-কাহিনী নিম্নরূপ—
একদা দেশে ভীষণ অনাবৃষ্টির ফলে হাহাকার পড়ে যায়। সকলে গাজী পীরের কাছে গিয়ে বৃষ্টির জন্যে, পানির জন্য (আল্লা পানি দে) অনুরোধ করতে থাকে। এই নিদারুণ কষ্টে গাজী সাহেব দরজা বন্ধ করে আল্লার কাছে পানি প্রার্থনা করতে করতে ধ্যানস্থ হন। তবে ধ্যান ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার দেহ স্পর্শ করতে নিষেধ করে যান, পীরের যোগবলে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। সবার মনে আনন্দ জেগে উঠে। পীরের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। বহু ভক্ত বহু শিরণি, গোলাপ জল প্রভৃতি দিতে থাকে। কিন্তু পীরগাজী আর ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করে বেরুছেন না। বহু স্তবস্তুতি করতে লাগলো সকলে। কিন্তু কোন সাড়া ভিতর থেকে এলো না। কিন্তু গাজী পীরের নির্দেশ অমান্য করে কেউ দরজা খুলতেও সাহস করছে না। পীরের আদেশ কেউ অমান্য করতে চায় না। এক পাঠান যুবক কারুর নিষেধ না মেনে অধৈর্য হয়ে দরজা ভেঙ্গে পীরের দেহ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানস্থ পীরের দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সকলে হায় হায় করতে লাগলো। পাঠান যুবক ভক্তটি চিরকাল সকলের কাছে নিন্দনীয় হয়ে রইলো। তার সেই স্থানটি হিন্দু-মুসলমানের কাছে এক পরম পবিত্র তীর্থ হয়ে উঠলো। তাই এই ঘুটিয়ারী শরিফে তাঁর সমাধিস্থানে প্রতি বৎসর বিরাট মেলা বসে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান এই সিদ্ধপীরকে প্রণাম জানাবার জন্য এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়। এই ঘটনা ঘটে— ১৭ই শ্রাবণ, তাই প্রতি বছর এই দিনটিতে এখানে বসে বিরাট মেলা, পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত এই মহান মুসলমান সাধক তাই দেবতার মত হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে সমান পূজা পান।

কালুরায়, ওলাবিবি, আটেশ্বর প্রভৃতি আরও বহু লৌকিক দেব-দেবীর পূজা সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কালুরায় কুমীরের দেবতারূপে, ওলাবিবি শীতলারূপে, আটেশ্বর পশুদের রক্ষাকারী দেবতা-রূপে পূজিত হয়। এখানে শুধু তিনজন প্রধান লৌকিক দেবতার আলোচনা করে এই অধ্যায় শেষ করলাম। যেহেতু লৌকিক দেবতা-দের পূজা লৌকিক সংস্কৃতির অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ, সেহেতু এদের আলোচনা করা হল। লৌকিক দেবতারা কোন শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক দেবতা নয়, এরা সম্পূর্ণ আঞ্চলিক এবং লোকাচারযুক্ত।

॥ ৭ ॥

কতিপয় মূল্যবান বক্তব্য

"আমাদের দেশের আদিম সংস্কৃতি আবিষ্কার করতে হলে পল্লী-সমাজের লৌকিক দেবতাদের স্বরূপ ও তাঁদের পূজাচারগুলির বিষয় অনুসন্ধান করতে হবে। ঐ পদ অনুসরণ করে পিছন দিকে গেলে দেশের সংস্কৃতির আদি উৎস দেখা যাবে আর জানা যাবে আদিকালে আমাদের দেশে যারা ছিল তাদের কথা"—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

"যে পর্যন্ত না কেহ এদেশের লৌকিক দেবতার বিষয় লিখছেন সে পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থাকবে।"
—রাধাগোবিন্দ বসাক।

"লৌকিক দেবতাদের আলোচনা দ্বারা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হইতে পারে।··· বাংলার নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব আলোচনায়ও ইহার মূল্য অপরিসীম।"—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

"আদিতে আর্যেরও সমাজে কৃষিজীবি অরণ্যবাসী অষ্ট্রিতে কৌম ও তাহাদের বংশধরগণ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে বা অন্য কোন পার্থিব

আপদ-বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী লৌকিক দেবদেবীর পরিকল্পনা ও পূজা করিত। এই ধরণের ভয়-ভক্তি সংক্রান্ত নানা উপধর্ম বা কালের প্রভাবেই বাংলাদেশে মঙ্গল-কাব্য সমূহের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। কাণ্ডার বাঘিনীচণ্ডী, সর্পবিভূষিতা মনসা, ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণ রায়—এ সমস্তই একটি প্রাচীন আরণ্যক সমাজ ব্যবস্থার স্মৃতিচিহ্ন।"—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড—১ম পর্ব।

এভাবে বহু প্রখ্যাত মনীষীদের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তবে যে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যে লৌকিক দেব-দেবীর বিষয় আলোচনার দ্বারা আঞ্চলিক সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আলোক পাওয়া যায় তার দ্বারা জাতীয় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য

॥ ১ ॥

জলপথ :

নৌকা, ডিঙ্গি ও ডোঙ্গা বা দাঁড় বাহিত জলযান :

সুন্দরবন নদীনালা পরিবেষ্টিত একটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। অসংখ্য ছোট বড় নদী ও ঝরা সুন্দরবনকে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে। সমগ্র সুন্দরবন প্রকৃতপক্ষে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি। এক একটির এমন ভৌগোলিক অবস্থান যে সে দ্বীপটি বড় বড় খাল বা নদীর দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত, যার ফলে এক দ্বীপের অধিবাসী সহজে অন্য দ্বীপের সহিত যোগাযোগ রাখতে পারে না। নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বাস বা রেল রাস্তা এখনও সবগুলি দ্বীপকে স্পর্শ করতে

পারে নি। নৌকা, ডোঙ্গা এবং ডিঙ্গী সুন্দরবনের একমাত্র প্রধান যানবাহন। সুন্দরবন ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত। এই জেলার প্রধান নৌ-যোগ্য নদীর নাম ছিল পূর্ব-সারকুলার ক্যানাল। বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে বা প্রাক্‌কালে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলি থেকে কলকাতায় আসতে হলে নৌযোগে হুগলী নদীর বারাতলা খাঁড়ির মধ্য দিয়ে ঢুকতে হতো। কলকাতা থেকে এই খাঁড়ির দূরত্ব ছিল প্রায় ৭০ মাইল। সোজাসুজি কলকাতায় আসার মত কোন নৌযোগ্য নদী ছিল না। ফলে নাসিকা বেষ্টন করে বঙ্গোপসাগরের উপকুল ঘেঁষে নৌকাগুলিকে আসতে হতো; এখনও এইভাবে আসতে হয়। দক্ষিণ মৌসুমীবায়ু প্রবাহের সময় নৌকাগুলি ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হতো। এখনো কালবৈশাখীর ঝড়ে বহু নৌকা ও যাত্রী মালপত্র সহ উপসাগরের অতল তলে মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যায়।

১৭৭৭ সালে মেজর টালী এই নৌযোগ্য পথটি আবিষ্কার করেন। এই পথটি আর এখন নাই। কালের কপোল স্রোতে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান কলকাতার ৮ মাইল দূরে গড়িয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণ মুখে হেষ্টিংস-এর কাছে গঙ্গা ও হুগলী নদীর সঙ্গম স্থলে এই পথটি এসে ঠেকেছিল। এই নৌপথটিকে তখন টালীর নালা বলা হতো। বর্তমান টালিগঞ্জ ১৭৭৭ সালে অর্থাৎ প্রায় দুইশত বৎসরের পূর্বে একটি গঞ্জ ছিল। বালিগঞ্জ-এর ইতিহাসও তাই। এখনকার ফ্রেজারগঞ্জের মত তখনকার বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ ছিল নদীর উপকুলস্থ ছোট ছোট মাছ ধরার ঘাঁটি—জেলে ও মাঝি মাল্লাদের অস্থায়ী বাসস্থান। ধান, চাল, শাক-সব্জী, মাছ প্রভৃতির ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র বা গ্রাম্য বাজার। যাহোক, এই নদীপথ পূর্বদিক বরাবর গিয়ে শামুক পোতা নামক স্থানে বিদ্যাধরী নদীর সংগে মিশেছে, ক্যানিং থেকেও এই পথে যাতায়াত করা যায়।

॥ ২ ॥

যন্ত্রচালিত জলযান ঃ

যন্ত্রচালিত জলযান বা ষ্টীমার সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করতো না; কারণ সুন্দরবনের মধ্যে প্রবাহিত খালগুলি অধিকাংশই অপ্রশস্ত ও অগভীর। ভাটার সময় অনেকগুলি খালের মধ্যে জল থাকে না। আবার যন্ত্রচালিত জলযান চালনায় তেল প্রভৃতির খরচ অনেক বেশী পড়তো। তাই বহুবার বিভিন্ন প্রস্তাব সত্ত্বেও ষ্টীমার কোম্পানীগুলি সুন্দরবনের মধ্যে যন্ত্রচালিত জলযান চালাতে রাজী হয় নি। তবে হুগলী নদী বরাবর বঙ্গোপসাগর দিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে ষ্টীমার চলতো। এখনও বহু ষ্টীমার কলকাতা থেকে হুগলী নদী ধরে হেতানীয়া-দোয়ানীয়া (বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী একটি নদী) নদীর মধ্য দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে যাতায়াত করে। এই জলপথ সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ দিয়ে প্রবাহিত। পূর্বাংশে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে টালী নালার মুখ পর্যন্ত আসতো কিন্তু ধাপার মাঠ পেরিয়ে আর ভিতরে আসতে পারতো না। কিছুদিন পরে এই জলপথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে কলকাতার তৎকালীন দুইটি বড় বাজার চিৎপুর এবং খিদিরপুরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, হুগলী নদীর জলপথটি অবশ্য খোলা ছিল। কিন্তু হুগলী নদীও বর্তমানে এত অগভীর হয়ে পড়েছে যে খিদিরপুর পর্যন্ত ষ্টীমার ঢুকতে পারছে না। যার জন্য মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় বিকল্প বন্দর সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ কলকাতা থেকে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণাংশে সরতে হয়েছে। হীরক বন্দরের প্রায় বিপরীত পার্শ্বে কিছু দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে নদীর মোহনায় হলদিয়া বন্দর গড়ে উঠেছে।

পূর্বাংশে যখন টালীর নালা খুব গভীর ছিল এবং কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ সহজ ছিল তখন বহু দেশী নৌকা এই জলপথ দিয়ে

প্রত্যহ যাতায়াত করতো। এই নৌকাগুলি সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে বহু জ্বালানি কাঠ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য নিয়ে আসতো। সুন্দরবনের প্রধান ব্যবসা ছিল জ্বালানি কাঠ সরবরাহ করা। টালী নালা মজে যাওয়ার পর বড় বড় দেশী নৌকাগুলি মাতলার শাখা নদী পিয়ালীর মধ্য দিয়ে কলকাতায় যাতায়াত করতে থাকে। এখনও বহু ছোট বড় নদী-নালার মধ্য দিয়ে জ্বালানী কাঠ নৌকা যোগে সরবরাহ করা হয়। গ্রীষ্মকালে যে সব নদীতে জল থাকে না বর্ষাকালে সেই-গুলোতে নৌকা চলাচল করতে পারে। যেখানে বড় বড় দেশী নৌকা ঢুকতে পারে না সেখানে ছোট ছোট ডিঙ্গি বা ডোঙ্গার দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এইভাবে ডিঙ্গি, ডোঙ্গা এবং নৌকাই সুন্দরবনের প্রধান যানবাহন। এ ছাড়া যাত্রী বা মালপত্র বহনের জন্য উপযুক্ত কোন যানবাহন নাই। এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে জলযানই একমাত্র প্রধান সম্বল ও সহায়ক। পূর্বে নৌকা ছাড়াও ষ্টীমারগুলি সুন্দরবন অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলিতে যাত্রী ও মালপত্র বহন করতো। বর্তমানে কোন ষ্টীমারের ব্যবস্থা নাই। পূর্বে হুগলী নদীর উপর দিয়ে কলকাতা থেকে নৈহাটী আর কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার থেকে টেঙ্গরা পর্যন্ত ষ্টীমার চলতো। আবার পূর্বাঞ্চলে ইচ্ছামতী এবং যমুনা নদীর উপর দিয়ে টাকী থেকে গোবরডাঙ্গা পর্যন্ত ষ্টীমার-সার্ভিস ছিল ; কাকদ্বীপ থেকে মেদিনীপুরের রসলপুর পর্যন্ত ষ্টীমার চলতো। বর্তমানে ষ্টীমার চলে না। কেবল সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনে বড় বড় নৌকা মেদিনীপুরের পেটুয়া, তেরপেখ্যা, বাছুরমারী, তালপাটি প্রভৃতি স্থান থেকে কাকদ্বীপে যাতায়াত করে। মানুষ,গরু-বাছুর ও মালপত্র বহন করাই নৌকাগুলির প্রধান কাজ। নৌকা ছাড়া বর্তমানে লঞ্চ সার্ভিস কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাতায়াত করে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে কুকড়াহাটি পর্যন্ত লঞ্চ চলে। এই পথ হয়ে হলদিয়া যাওয়া যায়। নুরপুর থেকে পাথর প্রতিমা, রায়দিঘী, ক্যানিং থেকে বাসন্তী, গোসাবা, ছোট

মল্লাখালী, দেউলবাড়ী, সাতজেলে প্রভৃতি স্থানে বর্তমানে লঞ্চ-সার্ভিস চালু আছে। কিছুদিন হলো ট্রলী-সার্ভিসও শুরু হয়েছে। ডিঙ্গিতে যন্ত্র বসিয়ে ডিঙ্গিগুলিকে দ্রুতগামী করা হয়েছে। এগুলি এখন সুন্দরবন অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, কারণ এগুলি দাঁড়বাহিত ডিঙ্গির থেকে প্রায় দশগুণ জোরে ছোটে, ফলে মাছ সরবরাহ খুবই সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। এতে লঞ্চের তুলনায় খরচ অনেক কম এবং কম জলের নদী-নালার মধ্যেও ট্রলী প্রবেশ করতে পারে। যেখানে কোনক্রমেই বাস রাস্তার দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় সেখানে ট্রলী-সার্ভিস ব্যাপক করা প্রয়োজন। সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তাহলে সুন্দরবনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আপৎকালীন ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

॥ ৩ ॥

স্থলপথ :

রেল ও বাস : .

রেলপথ—পূর্বে বৃহত্তর সুন্দরবনের সঙ্গে জেলার অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ রেলপথে তিনটি উপায়ে করা হতো। এখনও হয়ে আসছে। তিনটির মধ্যে এখন একটি কলকাতার সঙ্গে সুন্দরবনের সরা-সরি যোগাযোগ স্থাপন করছে। এই রেলপথের পূর্ব নাম ছিল পূর্ববঙ্গীয় রেলপথ (Eastern Bengal Railway)। এখন শুধু 'পূর্ব রেল' (Eastern Railway) বলা হয়। কলকাতার অন্তর্গত শিয়ালদহ স্টেশন থেকেই এই রেলপথ বেরিয়েছে। পূর্বরেলের দক্ষিণ বিভাগের তিনটি শাখা ডায়মণ্ডহারবার, বজবজ ও ক্যানিং। ক্যানিং লাইনটি অবশ্য সোনারপুর থেকে সম্প্রসারিত। বর্তমানে আর একটি রেলপথ যুক্ত হয়েছে। এইটি শিয়ালদহ থেকে লক্ষীকান্তপুর পর্যন্ত চলে। বজবজ বা লক্ষীকান্তপুর থেকে নামখানা পর্যন্ত একটি

নূতন রেলপথ হওয়ার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। সত্বর কার্যকর হলে সুন্দরবনের অশেষ উন্নতি হবে। এছাড়া উত্তরাঞ্চলে বারাসাত, দেগঙ্গা, বসিরহাট হয়ে হাসনাবাদ পর্যন্ত একটি রেলপথ সম্প্রতি হয়েছে। জেলার দক্ষিণ-পূর্বের রেলপথগুলি শিয়ালদহ থেকে বালিগঞ্জ, গড়িয়া, যাদবপুর, সোনারপুর, বারুইপুর হয়ে লক্ষীকান্তপুর এবং ডায়মণ্ডহারবারে আসে—পরে সোনারপুর হয়ে ক্যানিং আসে। সাগর দ্বীপে যেতে গেলে ডায়মণ্ডহারবার হয়ে যেতে হয়। সুন্দরবনের অন্তর্গত নামখানা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারিত হলে সাগর-সঙ্গম তীর্থযাত্রীদের পক্ষে যাতায়াতের খুবই সুবিধা হবে। যতদূর জানা যায় ক্যানিং পর্যন্ত রেলপথটি একটি বে-সরকারী কোম্পানী কর্তৃক প্রথম চম্পাহাটি পর্যন্ত তৈরী হয়। এই রেলপথটির প্রথম উদ্বোধন হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু মাতলা নদীর উপর ক্যানিং এর সহকারী বন্দর গড়ে উঠার অসুবিধা দেখা দেওয়ায় কোম্পানী কর্তৃক রেলপথ নির্মাণের কার্য-পরিত্যক্ত হয়। ১৮৬৮ সালে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার এই রেলপথ গ্রহণ করেন এবং ক্যানিং পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ কার্য সুসম্পন্ন হয়। হাসনাবাদ ও ক্যানিং পর্যন্ত রেলপথ দুটি কেবলমাত্র সুন্দরবনের মাছ, শাকসব্জী প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে এই রেলপথে সরবরাহ হয়ে থাকে।

বাস—পূর্বে ডায়মণ্ডহারবার রোড, উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড এবং বিষ্ণুপুর রোড নামে তিনটি প্রধান বাস রাস্তা কলকাতার সঙ্গে দক্ষিণ সুন্দর-বনের যোগাযোগ রক্ষা করতো। পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের কোন উল্লেখযোগ্য রাস্তা ছিল না। এখন অবশ্য নূতন নূতন অনেক বাস-রাস্তা হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। আরও বহু রাস্তা হওয়া দরকার। যে সরকারী এবং বেসরকারী বাসগুলি সুন্দরবন অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি কলকাতা যোগাযোগ রক্ষা করছে তার হিসাব করলে দেখা যায়—কলকাতা থেকে নামখানা পর্যন্ত প্রত্যহ সকালে দুটি এবং বিকেলে তিনটি বাস আমতলা,

ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ হয়ে নামখানা আসে। এতে সুন্দরবনবাসীর বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের অভূতপূর্ব উপকার হয়েছে। এই বাসের সংখ্যা আরও বাড়ালে সুন্দরবনের প্রভূত উপকার হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে। উত্তর-পূর্ব সুন্দরবন এলাকাতে দুইটি সরকারী বাস চলে। একটি কলকাতা থেকে বসিরহাট কোর্ট এবং আর একটি নৈহাটি পর্যন্ত যায়।

এছাড়া, দক্ষিণাঞ্চলে বহু বেসরকারী বাস চলে। নামখানা থেকে বকখালী, কাকদ্বীপ (কচুবেড়িয়া) থেকে গঙ্গাসাগর ধাম এবং ডায়মণ্ডহারবার থেকে রায়দিঘী পর্যন্ত কিছু বাস প্রত্যহ চলাচল করে। এখন পাথরপ্রতিমা ব্লকের সংগে কোন যোগাযোগকারী রাস্তা নাই। পূর্বাঞ্চলে বারুইপুর থেকে ক্যানিং, ক্যানিং থেকে বাসন্তী এবং সন্দেশখালি, বসিরহাট থেকে সন্দেশখালি এবং হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তরে স্বরূপনগর, হাবড়া, বাদুড়িয়া, গাইঘাটা প্রভৃতি স্থানে বাস রাস্তা আছে। সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা উত্তরাঞ্চল বেশী উন্নত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভালো। কলকাতা থেকে বারাসাত হয়ে হাবড়া ও গাইঘাটার পাশ দিয়ে একটি জাতীয় সড়ক (National High way) গিয়েছে। বারাসাত থেকে পুনরায় একটি রাষ্ট্রীয় সড়ক (State High way) বরাবর দেগঙ্গা হয়ে বসিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণাঞ্চলে শুধু একটিমাত্র রাষ্ট্রীয় সড়ক কলকাতা থেকে বেরিয়ে বেহালা, বিষ্ণুপুর, ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ ও নামখানা হয়ে বকখালী পর্যন্ত গিয়েছে। পূর্বাঞ্চলে এরূপ কোন সড়ক নাই। গোসাবা বাসন্তীর পর কোন বাস-রাস্তাই এখনও হয় নি। এই অঞ্চল এখনও খুবই অনুন্নত এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব এই অঞ্চলে খুব বেশী।

॥ ৪ ॥

শিল্প ঃ

সুন্দরবন অঞ্চলে এখনও কোন বড় বা মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেনি। এই অঞ্চলের প্রধান উৎপাদন ধান, মাছ, মধু ও জ্বালানি কাঠ। এই উৎপাদিত কাঁচামালগুলিকে কেন্দ্র করে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নি। অথচ ধান থেকে খড়জাত বা কুঁড়োজাত অনেক বড় বড় শিল্প গড়ে উঠতে পারে। মাছ ও মধু থেকে বহু রকম ভেষজ ও পশু-খাদ্য বা সারজাতীয় শিল্প গড়ার সম্ভাবনা আছে। জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি বনজ সম্পদ থেকেও বহু শিল্পের সৃষ্টি হতে পারে। 'সুন্দরবন বিচিত্রা' গ্রন্থে 'বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদ' শিরোনামে এর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য উৎপাদকগণ উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না ; সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দালালরা মুনাফা লুটছে। বর্তমান কাকদ্বীপ, রায়দীঘি, ক্যানিং, হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থানগুলি বিশেষ বিশেষ বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। লরী এবং লঞ্চ যোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক বা ব্যবসায়ীগণ যাতে স্বল্প মূল্যে মালপত্র বহন ও সরবরাহ করতে পারে তার জন্য সরকার বা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ শুধু উৎপাদন বাড়লে কোন সমাধান হবে না। বরং সমস্যা আরও জটিলতর হয়ে উঠবে। অধিক দ্রব্যের আমদানীর ফলে বাজার দর কমে যাবে। সুতরাং উৎপাদন বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বা হলদিয়ায় রপ্তানি করার জন্য যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। শুধু বাস বা রেলপথ নয় জলপথের যানবাহন বাড়াতে হবে, ছোট ছোট সংযোগকারী রাস্তাগুলিকে পাকা করতে হবে যাতে রিক্সা বা টেম্পোর দ্বারা সদা সর্বদা মালপত্র বহন করার সুবিধা হয়। শিল্প সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হবে।

॥ ৫ ॥

মন্তব্য ঃ

যাহোক্, সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই শোচনীয় যে সুন্দরবনের মানুষ এখনও সভ্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। আর এই যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে সুন্দরবনের মানুষ এখনও উন্নত কৃষি, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানে সম্পূর্ণ অক্ষম। উন্নত জ্ঞানী লোক সুন্দরবনের গহন বন অঞ্চলে না পৌঁছানোর জন্য মানুষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিভিন্ন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এক অবাঞ্ছিত জীবন যাপন করে। শিক্ষা-দীক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় এখনও তারা বিভিন্ন সুযোগসন্ধানী সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের হাতিয়ার হয়ে পড়েছে। জমিদারের কুশাসন বা শোষণ এখন না থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থান্বেষী কর্মীদের দ্বারা তারা নিগৃহীত ও শোষিত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে এই অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনার হাত থেকে সুন্দরবনবাসী মুক্তি পাবে। সুন্দরবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি হবে। তবে সর্বদা আপন বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে অগ্রগতির উচ্চ শিখরে ধাপে ধাপে উঠতে হবে।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মধ্যে মানুষ ও হিংস্র জন্তু দীর্ঘদিন ধরে সহাবস্থান করে চলেছে। জলের কুমীর আর জঙ্গলের নরখাদক বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে তারা তাদের জীবিকা অর্জন করছে ; কিন্তু এই সুন্দরবনে বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বর্বর ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে আজও টিকে রয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের সংস্কৃতির বহু নিদর্শন। প্রাচীন ও আধুনিক

বহু দর্শনীয় স্থান সুন্দরবনের গৌরব ঘোষণা করেছে এবং ভ্রমণ-কারীদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যেমন সুন্দরবনের পূর্ব-উত্তরাঞ্চলে রয়েছে ধপ্‌ধপির দক্ষিণ রায়ের মূর্তি, বনবিবির মুর্তি, ঘুঁটিয়ারী শরিফে গাজী পীরের থান, চন্দ্রভোগে পাতাল গঙ্গা, চক্রতীর্থ, শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপীঠ, জটার মন্দির। ঠিক সেরূপ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে রয়েছে পুরাণ প্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন যুগের সাগর তীর্থে কপিল মুনির আশ্রম, ভগীরথ ও সগর বংশের উদ্ধারের পুণ্যকাহিনী বিজড়িত পুণ্যভূমি গঙ্গা-সাগর ধাম। তট বা লুধিয়ান সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বা অভয়ারণ্যের নিকটবর্ত্তী প্রতাপাদিত্যের নির্মিত বহু দুর্গের ভগ্নাবশেষ, বকখালির মনোরম সমুদ্র সৈকত, কাকদ্বীপ, নামখানা অঞ্চলের বহু প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীর মন্দির। তাদের মধ্যে আবৈশ্বর মন্দির, বিশা-লাক্ষী মন্দির, আঠনাকাল মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী গ্রন্থে এদের বিশদ বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো। যাহোক্, সুন্দরবন শুধু সুন্দরী বৃক্ষের জঙ্গল নয় বা ব্যাঘ্র কুমীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল নয়—বহু প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি রূপেও এর একটি বিরাট পরিচয় আছে। প্রকৃতির বক্ষে এই সংস্কৃতিময় সুন্দরবনের রূপ সত্যই সুন্দর।

পঞ্চম অধ্যায়

শিল্পকলা

॥ ১ ॥

অর্থসংকেত :

"ওঁ শিল্পানি সংসন্তি দেব শিল্পানি, এতেষাং বৈ
দেব শিল্পানাম্ অস্কৃতীঃ শিল্পম্ অধিগম্যতে
হস্তীকংসো বাসো হিরণ্যম্ অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।"

শিল্প সম্বন্ধে ঐতেরীয় ব্রাহ্মণের ঐটি একটি অতি প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতি। এই অনুচ্ছেদটির অর্থ—'শিল্প সমূহ দেব-শিল্প সমূহকে প্রশংসা করে।

দেব-শিল্পের অনুকৃতীকেই পৃথিবীতে শিল্পরূপে ধরা হয়। হাতির দাঁতের কাজ, কাঁসার কাজ, বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কারেব কাজ, অশ্বতরীযুক্ত বথ প্রভৃতিকে শিল্প বলা যায়।' এই সংজ্ঞা থেকে দুটি অর্থ প্রতীয়মান হয়। একটি দেব-শিল্প, অপরটি পার্থিব বা মানব-শিল্প। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়েব মতে—'প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থকে, প্রাকৃতিক স্থানকে, প্রাণীজগতেব বিচিত্র জীবকে, উদ্ভিদ জগতের যাবতীয় বস্তুকে, বাতাস-জল-আকাশ-আলোকে, নৈসর্গ শক্তিব সমস্ত প্রকাশকে 'দেব-শিল্প' বলা যায়। মানুষের সৃষ্ট শিল্পকে মানব-শিল্প বা পার্থিব-শিল্প বলা চলে। কারণ পার্থিব-শিল্প দেব-শিল্পের অনুকৃতি। যেমন—হাতির দাঁতের কাজ বা পিতল কাঁসাব কাজ। ডঃ বায় বলেছেন—'শুধু এগুলি নয়, এমনকি সন্তান-প্রজনন, সন্তান-পালন, খাদ্যোৎপাদন প্রভৃতি কর্মও শিল্পেব অন্তর্ভুক্ত। যাহোক্ শিল্প সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। কারণ শিল্পেব দ্বাবা মানবাত্মার সংস্কাব সাধিত হয়। এর মধ্যে আছে ছন্দ ও নিয়ম শৃঙ্খলা, জীবনভূমির উপযুক্ত কর্ষণের জন্য এগুলির প্রযোজন অনস্বীকার্য।

শিল্প প্রধানতঃ দুই প্রকার—কারু-শিল্প ও চারু-শিল্প। ঐতেরীয় ব্রাহ্মণে যে শিল্পগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি সবই কারু-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চারু শিল্পেব অন্তর্গত। লোক-সঙ্গীত ও চর্যাগীতির কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন চিত্র-শিল্পের কথা বলতে গেলে ডঃ রায়েব ভাষায় বলতে হয—"চারুকলার ক্ষেত্রে আমাদের ব্রত ও মঙ্গলানুষ্ঠানের আলোচনায়, কাঁচা বা পোড়া মাটির তৈরী পুতুল ও খেলনায়, মনসা ও গাজীর পাঠপত্রে, মাটিলেপা বেড়ার উপর, অধা সরা ও ঘরের উপর নানা রঙীন চিত্র ও নক্শায়। কাঁথার উপর বিচিত্র সূচী কার্যে, ঝুলানো শিকার পরিকল্পনায়, খুঁটি ও খড়ের তৈরী ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা ঘরে। নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে এবং আরও নানা প্রকারের গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই প্রবাহমান।"

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিল্পকলা প্রসঙ্গে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির শিল্প ও চিত্র-শিল্পের বিষয় আলোচনা করেছেন। চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন—"রেখা বিন্যাস ও বর্ণ সমাবেশ এই দুইয়ের উপরই চিত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং এই দুইটির প্রাধান্য অনুসারে চিত্রের প্রধান দুই শ্রেণী-বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। অজন্তা ও ইলোরার চিত্র-শিল্পে এই দুই শ্রেণীর চিত্র দেখা যায় এবং পরবর্তীকালে ভারতের সর্বত্রই ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ভারতের চিত্রে রেখা-বিন্যাসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাংলায় চিত্র-শিল্পে বর্ণ-সমাবেশ ও রেখা-বিন্যাস উভয়েরই প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।" তবে তিনি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে পশ্চিম ভারতের চিত্র-শিল্পের তুলনায় বাংলার শিল্পীগণ রেখা চিত্রে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর ভাষায়—"কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে চিত্র অঙ্কনে বাংলার শিল্পীগণ কতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মন পালের তাম্র শাসনের অপর পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখা চিত্র তাহার দৃষ্টান্ত।"

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে ডোম্মন পাল সুন্দরবনের খাড়িতে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং আমরা এই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে,সুন্দরবন অঞ্চলে রেখা-চিত্রের বা চিত্র-শিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার বলেছেন 'বৌদ্ধ স্তূপই ভারতের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রাকৃতির স্তূপ দৃষ্ট হয়। স্তূপ ব্যতীত কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাজের জন্য নির্মিত বিহারও স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। স্তূপ ও চিহ্ন ছাড়া ছোট বড় বহু মন্দির বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উন্নত শিল্পকলার সাক্ষ্য বহন করে। সুন্দরবনের জটার দেউলের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এটি বাংলার উৎকৃষ্ট মন্দির শিল্পের অন্যতম।

বাংলা দেশে স্থাপত্যের মত ভাস্কর্যেরও প্রভুত উন্নতি হয়েছিল।

মন্দির মধ্যস্থ দেবমূর্তিগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুন্দরবনের অন্তর্গত কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে পরিগণিত হয়। এই মূর্তি সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে—"সুন্দরবনের কাশীপুরে প্রাপ্ত পূর্ণ প্রতিমাটিতেও মার্জিত রসবোধ ও অধ্যাত্ম চেতনার আভাস দৃষ্টি-গোচর। এই প্রতিমাটিতে গুপ্তশ্রেণীর পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যতটা ধরা পড়িয়াছে বাংলায় প্রাপ্ত আর কোন প্রতিমাতেই এমন সুস্পষ্ট হইয়া তাহা ধরা পড়ে নাই। কালবিচারে কাশীপুরের প্রতিমাটি হয়তো দেওড়ার প্রতিমা অপেক্ষা প্রাচীনতর, কিন্তু গঠন সৌষ্ঠবে কাশীপুরের মূর্তি অনেক বেশী মার্জিত দৃষ্টি ও কল্পনায় গভীরতর।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন সুন্দরবন শিল্পকলায় বাংলাদেশের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কোনক্রমে অনুন্নত ছিল না, বরং অনেকাংশে অধিকতর উন্নত ছিল। ডঃ রায়ের মতে 'প্রাচীন বাংলার ধর্মগত বস্তু মোটামুটি তিন শ্রেণীর—স্তূপ, বিহার ও মন্দির। স্তূপ ও বিহার সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে এদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় মন্দিরের সংখ্যা ছিল অনেক।' তাঁর মতে 'ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে মন্দিরেই যাহা কিছু বাংলার বৈশিষ্ট্য। বাংলার মন্দিরই যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট মন্দির স্থাপত্যের মূল প্রেরণা।' নির্মাণ-রীতি ও শৈলীর দিক থেকে মন্দির স্থাপত্য-শিল্পকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) ভদ্র বা পীড় দেউল। (২) রেখে বা শিখর দেউল। (৩) উপযুক্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। (৪) শিখর যুক্ত পীড় বা ভদ্র দেউল—এই চারটি রীতির অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলির এখন কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

॥ ২ ॥

সুন্দরবনের প্রাচীন মন্দির

"সুন্দরবনের প্রাচীন মন্দিরগুলি বঙ্গসংস্কৃতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাই এগুলির আলোচনা অপরিহার্য। বঙ্গ সংস্কৃতির পরিচয় পেতে হলে তার অতীতেব রূপ রেখার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং এই অনুসন্ধান সফল হবে তখনই যখন আমরা বঙ্গ সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলির আদিরূপের সাথে পরিচিত হব। জীর্ণ পুরাতন মন্দিরের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এইখানেই।" '২৪ পরগণার মন্দির' গ্রন্থে অসীম মুখোপাধ্যায় সুন্দরবন অঞ্চলের কতিপয় অতি পুরাতন মন্দিরেব উল্লেখ করেছেন—যেমন জটাব মন্দির। তাঁর ভাষায় "২৪পবগণা জেলার অন্যতম প্রাচীন মন্দির হল জটার দেউল। উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মনি নদীর পূর্বতীরের বনভূমি পরিষ্কার করে বসতি পত্তনের সময় এই মন্দিবটি আবিষ্কৃত হয়।…জটার দেউলের নির্মাণকাল নিঃসন্দেহে হিন্দুযুগ। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের অনতিদূরে একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। তাম্রলিপির ভাষা অনুসারে ৮৯৭ শকাব্দে বা ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়ন্ত এই মন্দির নির্মাণ করেন।" তিনি বলেন—প্রাচীন হিন্দুযুগে চার শ্রেণীব মন্দির নির্মাণ হতো; যথা—(১) রেখ বা শিল্পের দেউল, (২) পীড়া বা দেউল, (৩) শিখর শীর্ষ পীড়া বা ভদ্র দেউল এবং (৪) স্তূপ শীর্ষ পীড়া বা ভদ্র দেউল। রেখ বা শিখর শৈলীর মন্দিরই নির্মিত হয়েছিল বেশী। এতে উড়িষ্যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জটার দেউল উপবোক্ত বীত্যানুসারে নির্মিত। এছাড়া দুর্গম সুন্দরবনের আরও কতিপয় বিগতশ্রী জীর্ণ দেহ দেউলের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তিনটি প্রধান, যেমন— 'প্রথমটি জটার দেউলের নিকটবর্তী দেলবাড়ী গ্রামে অবস্থিত। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ মধ্যে আবিষ্কৃত। এটিও রেখ দেউল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ভোগমণ্ডপ, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, দুর্গামণ্ডপ ইত্যাদির গঠন পরিকল্পনা ও অঙ্গ সজ্জায় ইউরোপীয় প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্বন হোল।" খড়দহে গঙ্গাতীরে শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ, দক্ষিণেশ্বর ও টিটাগড়ের নবরত্ন মন্দির সংলগ্ন নাট্যমণ্ডপগুলিতে ইউরোপীয় প্রভাব দৃশ্যমান। 'পাশ্চাত্য প্রভাব, মুসলমান ও হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে অবক্ষয়ের যুগে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের বীজ বপন করেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, নতুবা স্রোতহীন জলধারায় জাতির জীবন শৈবালাকীর্ণ হয়ে ওঠে। সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারায় এই অনিবার্য পরিবর্তন সুন্দরবনের লোনামাটিতে তার গভীর পথচিহ্ন অঙ্কিত করে গেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ ধর্ম কর্ম ঃ ব্রত আচার ॥

॥ ১ ॥

লৌকিক ধর্ম

"বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ় পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্যজন"—এক কথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার-অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।" ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের এই উক্তি থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে সুন্দরবনের ধর্মকর্ম, ব্রত-আচার আদিবাসী ও তপশীল শ্রেণীভুক্ত অধিবাসীর দ্বারা প্রভাবিত। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই অঞ্চলের আদিবাসীরা পশু, পক্ষী, ফল, ফুল, বৃক্ষ, পাথর প্রভৃতির উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করে। এরা পশুপক্ষীর মধ্যে বাঘ বা বাঘের দেবতা বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের পূজা করে। লৌকিক দেবদেবী প্রসঙ্গে এর আগে বিশদ আলোচনা করেছি। সাপের বা সর্পদেবতা মনসার

পূজা এখানে খুব বেশী প্রচলিত। আর কুমীরের দেবতা কালু রায়ের পুজা এ অঞ্চলের একটি বিশেষ পূজা। এই পূজা উপলক্ষে হাঁস, মুরগীর বলি দেবার প্রথা খুবই জনপ্রিয়। অন্যান্য অঞ্চলের মত তুলসীগাছ ও বটগাছকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। এইগুলি আরণ্যক সংস্কৃতির পরিচায়ক। মনসাগাছ বা মনসাগাছের ডালকেও পূজা করার রীতি আছে।

কৃষিপ্রধান গ্রাম বাংলার সব কয়টি ব্রত-আচারও এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম দেবতার থানে পূজা দেওয়া বা বছরের বিশেষ বিশেষ দিন মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে। হাল-চাষ প্রথমে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়ে থাকে। আবার চাষের পর পৌষ সংক্রান্তিতে শুক-সারীর মিলনোৎসব, নবান্ন প্রভৃতি পূজায় ব্রাহ্মণের কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বিনা মন্ত্রেই এই সব পূজা হয়ে থাকে।

স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব আদিবাসীদেরই ধর্মাচরণ, যাত্রা অর্থে নৃত্যগীতসহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সুন্দরবন অঞ্চলে গঙ্গাসাগরের স্নানযাত্রা খুবই প্রসিদ্ধ। যাত্রা ও ধ্বজাপূজার মতো ব্রতোৎসব বাঙালীর ধর্মজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। ব্রত মানে আবৃত করা বা বরণ করা। ব্রতগুলি স্ত্রী-আচার যুক্ত এবং বৈদিক যাদুবিদ্যার অন্তর্গত।

ষষ্ঠীব্রত, চতুর্দশীব্রত, পূর্ণিমাব্রত, ঋতুব্রত প্রভৃতি বহু ব্রত আছে।

॥ ২ ॥

বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম

সমগ্র বিশ্বে একটি জাতি আছে সে জাতির নাম 'মানুষ জাতি।' সুতরাং মানব ধর্ম একটি, কিন্তু স্থান ভেদে মানুষের ধর্মের প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে প্রধানতঃ তিন প্রকার ধর্ম আছে বলা যায়—

হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্ম। কাল ভেদে ও প্রচারক ভেদে এই তিন ধর্মের আবার একাধিক শাখা-প্রশাখা লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানের মধ্যে যেমন সিয়া সুন্নী সম্প্রদায়গত ধর্মীয় বিভাগ দেখা যায়, ঠিক তেমন খৃষ্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট্ নামক দুটি ধর্মীয় দল আছে। হিন্দু ধর্মেরও সেরূপ একই সম্প্রদায়গত বিভাগ দেখা যায়। এই বিভাগ থেকে সৃষ্টি হয় তীব্র বিভেদ। এই বিভেদ সময়ে সময়ে এমন চরম আকার ধারণ করে যে তা জাতীয় সংহতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অতএব ধর্মীয় সম্প্রদায়িক বিভেদ সর্বদা বর্জনীয়। 'এক জাতি এক ধর্ম' আদর্শ বিশ্ব মানবের জয়গান হওয়া তাই একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। হিন্দু ধর্মের প্রধানতঃ ভারতবর্ষে পঞ্চ সম্প্রদায়, যেমন—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য। শৈব সম্প্রদায় শিবের উপাসক, শক্তির উপাসকদের বলা হয় শাক্ত, বিষ্ণুর ভক্তগণ বৈষ্ণব নামে পরিচিত। সূর্য ও গণপতির উপাসকগণ যথাক্রমে সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তিনভাগে ধর্মের বিভাগ দেখা যায়। যথা—বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক। পূর্বে লৌকিক ধর্মের কথা আলোচনা করেছি। এখন বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো।

বিষ্ণু—বিষ্ণু বেদ ও পুরাণ বর্ণিত শ্রেষ্ঠ দেবতা। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধারী মূর্তি সর্বত্র পূজিত হতো। খনন কার্যের দ্বারা ভূগর্ভ থেকে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে সব কয়টি এইরূপ এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী যুক্ত। দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্তিই প্রচলিত, বরিশাল জেলায় এই বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এই থেকে অনুমান করা যায় যে, এই সব অঞ্চলে বিষ্ণু ভক্তের সংখ্যা অধিক ছিল।

শিব—শিবের লিঙ্গ পূজাই সমধিক প্রচলিত। বাংলা দেশে যে সব শিব মন্দির আছে সব কয়টিতে লিঙ্গই পূজিত, স্থানে স্থানে দ্বিভূজ বা চতুর্ভুজ নীলকণ্ঠ, সর্পভূষিত মূর্তিও পূজিত হয়। রাজশাহী জেলার গণেশপুরে ত্রিশূলধারী শিবমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে

বহু শিব মন্দির থাকায় প্রমাণিত হয় যে সুন্দরবনে যথেষ্ট শৈব সম্প্রদায় ছিল। বৈষ্ণব ও শৈবের সংখ্যা সুন্দরবনে প্রায় সমান সমান বলা যায়।

শক্তি মূর্তি—কালী বা দুর্গামূর্তিও সুন্দরবন অঞ্চলে কিছু কিছু পাওয়া গেছে। তবে বিশালাক্ষ্মী বা শীতলা পূজার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

সূর্য মূর্তি—কাশীপুরের সূর্যমূর্তি থেকে অনুমান করা যায়, সুন্দরবনে সৌর সম্প্রদায়ও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। কপিলানন্দ মঠে (সাগর দ্বীপে) সূর্য পূজা হয়।

সিদ্ধিদাতা গণপতি—ব্যবসায়ী মাত্রে গণপতির পূজক, সুতরাং সুন্দরবন অঞ্চলে গণপতির উপাসকও আছে। তবে একথা বলা যায় যে, কোন শুদ্ধ সম্প্রদায় নাই, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় একই সঙ্গে পঞ্চ দেবতার পূজা হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে কিছু গোঁড়ামি লক্ষ্য করা যায়। শুদ্ধ বৈষ্ণবেরা কেবলমাত্র বিষ্ণু বা বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। বৈষ্ণব ধর্মই সুন্দরবনে জাতিভেদ দূরীভূত করতে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বেশীর ভাগ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

জৈন, বৌদ্ধ, ও মুসলমান ধর্মের প্রভাবও সুন্দরবনে যথেষ্ট দেখা যায়। পরে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার বাসনা আছে।

এখানে শুধু বেদ পুরাণ প্রসিদ্ধ সাগর দ্বীপের বিভিন্ন মন্দিরের বর্ণনা দিব। শ্রীজগন্নাথ মাইতি মহাশয় তাঁর 'মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর' গ্রন্থে কতিপয় মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"সাগরের বিখ্যাত কপিল মুনি মন্দির ছাড়া আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য মন্দির রহিয়াছে। তন্মধ্যে ধব লাটের বিশালাক্ষ্মী ও মনসা মন্দির। চেমাগাড়ী, রুদ্রনগর, নরহরিপুর, ধসপাড়া, বামনখালী ও গঙ্গাসাগরের শিব মন্দির। ধসপাড়ার কালী মন্দির ও গঙ্গাসাগরের যোগেন্দ্র মঠের লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির অন্যতম। সাগরে কয়েকটি মসজিদও আছে।" রায়দীঘি অঞ্চলে খৃষ্টানদের গীর্জাও দেখা যায়।

ধবলাটের বিশালাক্ষ্মী মন্দির ও বিগ্রহ অতি প্রাচীন। বিশালাক্ষ্মী দেবীর বিগ্রহ কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত। এই মূর্তি স্বপ্নাদেশে সমুদ্র গর্ভ থেকে প্রাপ্ত। এখানে একটি দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্তি আছে। মূর্তিটি সন্ন্যাসী প্রদত্ত। এই মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত আটেশ্বর শিব লিঙ্গ ও প্রস্তর নির্মিত কৃষ্ণ ও ধাতু নির্মিত রাধাব মূর্তি আছে। এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে অতীতকালে সুন্দরবনে শিব, বিষ্ণু, বিশালাক্ষ্মী এমনকি রাধা-কৃষ্ণ একই সঙ্গে পূজিত হতো। এর থেকে ধর্মমতের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে সুন্দরবনে অতীতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পূজো করতো। এখনও সেইরূপে প্রচলিত আছে।

সপ্তম অধ্যায়

সুন্দরবনের সংস্কৃতি কেন্দ্র ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সুন্দরবনের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- গজমুড়ি, রায়দীঘি, কঙ্কনদীঘি, জটা, ভরতগড়, বকুলতলা, রাক্ষসখালি, বাড়িভাঙ্গা, বাইশহাটি, নলগোড়া, মনিরতট মৈপীঠ, মাধবপুর দোলবাড়ী, ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, জলখাটা, এবং উত্তর-পূব-পশ্চিমে—সরিসাদহ, কাজিরডাঙ্গা মালিপাড়া, কাশিপুর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, শাসন, আটঘরা, বোড়াল প্রভৃতি গ্রাম। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে গ্রামগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১। গজমুড়ি—খাসির সংলগ্ন পল্লী, এখানে একটি তিন ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তি স্থানীয় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পূজিত হয়।

২। **বকুলতলা**—সাধারণ পল্লী, এখানে একটি পুষ্করিণী খনন-কালে গত শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সম্পাদিত একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়, তা থেকে জানা গেছে—মহারাজ তাঁর রাজ্য শাসনের দ্বিতীয় বৎসর পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ি মণ্ডলের মধ্যে কান্তাল্লপুর চতুরকে মণ্ডলগ্রাম নামে একটি পল্লীর অংশ শ্রীকৃষ্ণধর শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেছেন। ঐ গ্রামের সীমান্তে চিতরিঘাটা (পল্লী বা শাখা নদী) আছে। বর্তমানে বকুলতলার নিকট চিতরি নামে খাল দেখা যায়, বোধ হয় আদি গঙ্গানদীর কোন শাখা ছিল। এই তাম্রশাসনটি ঐতিহাসিকদের কাছে 'জয়নগর তাম্রশাসন' বলে পরিচিত।

৩। **বাড়িভাঙ্গা**—পল্লী, খাড়ির উত্তরে। পুষ্করিণী খননকালে এ পল্লী থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি বাড়িব ধ্বংসাবশেষ প্রস্তরের একটি দশভূজা দূর্গার এবং তিনটি বিষ্ণুমূর্তি, সবগুলি পালযুগীয় মনে হয়, মূর্তি চারটি ঐ পল্লীতে আছে।

৪। **জটা বা জটার দেউল**, খাড়ি থেকে ৫।৬ মাইল উত্তর পূর্বে। পল্লী ঠিক নয়, একটি প্রান্তরের মত স্থান, লোকের বসতি খুব কম। মাঠের পর মাঠ বা ধান ক্ষেতের মধ্যে প্রায় তিন বিঘা উঁচু জমির উপর বিরাট ও গম্ভীর মূর্তিতে দেখা যায়। হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির, জটার দেউল, মন্দিরের ভিৎ মাটির নীচে কিছু বসে গেছে, তবুও এখন প্রায় আশি ফুট দীর্ঘ আকৃতি নিয়ে বহু ক্রোশ ব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তরে সাক্ষাৎ দেয়। সুন্দরবন ভূখণ্ডের লুপ্ত গৌরবের বিষয়। এই লবণাক্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের পর দূর্যোগ অবহেলা উপেক্ষা করে জটার দেউল প্রায় অক্ষত দেহে আছে। এর মস্তক ভাগ শুধু কিছু দিন আগে ইংরেজ আমলে ১৯০৮ সালে তৈরী। শোনা যায় মন্দিরটির চূড়ার মধ্যে ধনরত্ন আছে ভেবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন কর্মচারী ওটি ভাঙেন। মন্দিরটির প্রবেশ দ্বার পূর্ব দিকে, উচ্চতা প্রায় ১৬ ফুট বিশাল পত্রাকৃতি। মন্দিরটির তলদেশ চতুষ্কোণ, গর্ভগৃহ প্রবেশ দ্বার

থেকে প্রায় ৬ ফুট নিচে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়, জটার দেউল শিল্পশাস্ত্র অনুসারে শিখর বা রেখ দেউল। এর কোন কোন স্থানে এখনও পোড়ামাটির শিল্পকার্য দেখা যায়। বর্ধমানের ইছাই ঘোষের দেউল ও বীরভূমের বহু লাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। জটাধর শিবের নামানুসারে মন্দিরটির নাম জটার দেউল হয়েছে বলে অনেকের অনুমান।

গত শতাব্দীর মাঝের দিকে ইংরেজ সরকার সুন্দরবনের এই অংশ জঙ্গলমুক্ত করার সময় জটার মন্দিরটি প্রকাশ পায়, সে সময় সরকারী প্রচার থেকে জানা যায় ঐ মন্দিরের মধ্যে বহু কঙ্কাল এবং একটি ৮।৯ বছরের বালকের আকৃতি মূর্তি ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে এই মূর্তি ঐ মন্দিরে দেখা যায়নি, সে কারণ জটার দেউল কোন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ দেবতার তা আজও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। স্থানীয় প্রবাদ শিবের মন্দির, জটার মন্দিরের কাছে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বা খোদিত একটি তাম্রপটলি পাওয়া যায়। তা থেকে জানা গেছে, ঐ দেউলটি ৮৯৭ শকাব্দে (খ্রীঃ ৯৭৫ সালে) রাজা জয়ন্তচন্দ্র তৈরী করেছেন। সরকারী বিবরণ থেকে আর বেশী কিছু জানা যায় না এই জয়ন্তচন্দ্র কে ? পালরাজাদের কোন সামন্ত নৃপতি কিংবা চন্দ্রবংশীয় তাহা স্থির হয়নি। ইতিহাস থেকে জানা যায় পালরাজাদের সময়েই দক্ষিণ-বঙ্গের কোন্ কোন্ স্থান চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। জটার দেউলের কাছে একটি স্থানে কয়েকটি আরোহীসহ হাতির মূর্তি দেখা যায়। জটার দেউলের এক মাইল দূরে ছাতুয়া নদীর তীরে একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ ও তলদেশের বিস্তার চার পাঁচ বিঘা। কাছে রায়দীঘি নদী, ভাটার সময় পশ্চিম তীরে নদীর বুকে দেখা যায়, ইটের প্রাচীর বা গৃহের ভগ্নাংশ।

৫। ভরত গড় বা ভরত রাজার গড় একেবারে চব্বিশ পরগণা সুন্দরবনের পূর্ব সীমান্তে, জটার মৌজা থেকে সাত আট মাইল দূরে। এখানে কয়েকটি স্তূপ দেখা যায় বৃহৎ আকারের তুটিকে দেখিয়ে স্থানীয়

লোকেরা বলে ওর একটি ভরত রাজার প্রাসাদ, অপরটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এর কিছু দূরে আর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তার পরিচয় 'বিরিঞ্চির মন্দির' স্থানীয় একটি খালের পাড়ে একটি দুর্গের ও দুর্গ প্রাচীরের লুপ্ত প্রায় ধ্বংসাবশেষ কিছু দেখা যায়। তা থেকে ভরত রাজার বিষয় জানা গেছে। তিনি পাল রাজাদের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। পরে পালযুগের পতনের কিছু আগে স্বাধীনভাবে এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। ভরত গড় থেকে বুদ্ধদেবের মূর্তি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ভরতগড়ের ও তার নিকটের স্তূপগুলি বৌদ্ধ বিহার বা মঠের ধ্বংসাবশেষ। আরও জানা যায় চব্বিশ পরগণার এই উত্তর-পূর্ব অংশে পালযুগে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল। এ বিষয় স্থিরভাবেও বলা যায় বৌদ্ধযুগের বিখ্যাত কলাগুা বিহার (বর্তমান এই জেলার বসিরহাট মহকুমার মধ্যে) এই অঞ্চলের মাইল কুড়ি দূরে ছিল।

৬। খাড়ির কাছে **রায়দীঘি** পল্লী ও তার মাইল দুই দূরে **কঙ্কনদীঘি** পল্লী। রায়দীঘি নদীর পূর্ব তীরে। রায়দীঘি নাম হয়েছে এখানকার বিরাট দীঘি থাকায়। দীঘিটি এখনও আয়তনে প্রায় একশত বিঘা, চারদিকের পাড় ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু। রায়দীঘির কাছ থেকে একটি বুদ্ধদেবের ও একটি জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের মূর্তি-প্রস্তর পাওয়া গেছে। কঙ্কনদীঘি ঝোপে-ঝাড়ে ও ছোট ছোট স্তূপে ভরা। এখানে কয়েকটি বড় বড় দীঘি আছে, সেগুলি প্রায় শুষ্ক, আগাছায় ছেয়ে ফেলেছে। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচ ফুট উঁচু সুন্দর একটি বিষ্ণুমূর্তি ও নবগ্রহ প্রস্তর ফলক এই ফলকটি প্রস্থে প্রায় সাড়ে তিন ফুট ও উচ্চতায় দেড ফুট ; এই দুটিই অতি সুন্দর এবং পালযুগের উন্নত শিল্পের পরিচয় দেয়।

৭। খাড়ি থেকে তিন মাইল পশ্চিমে **নলগোড়া** পল্লী। এখানকার হাসিলের পর নদীর তীরে কয়েকটি স্তূপ দেখা যায়। বৃহৎ স্তূপটি 'মঠবাড়ী' বলে পরিচিত। এর উচ্চতা প্রায় ত্রিশ ফুট ও তলদেশের

বিস্তৃতি সাড়ে তিন বিঘার মত, কিছুকাল পূর্বেও ছিল, কিন্তু ক্রমশ ক্ষয় পেয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এই মঠবাড়ীর কিছু দূরে একটি বড় পুষ্করিণী আছে, আয়তনে প্রায় ৪০ বিঘা নলগোড়া পল্লী থেকে পাঁচটি ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রোঞ্জের ও ছুটি প্রস্তরের মূর্তি এবং একটি বিচিত্র হংসাকৃতি ও হংসমূর্তি খোদিত প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রোঞ্জে তৈরি মূর্তিগুলির মধ্যে একটি বৌদ্ধদেবী হারিতির, অপর ছুইটি বিষ্ণুর ও উমা মহেশ্বরের, প্রস্তরের ক্ষুদ্র মূর্তিগুলি কোন দেবতার বোঝা যায় না।

এখান থেকে কিছু দূরে নলগোড়া ও মনি নদীর মধ্যে চন্দ্রকেতুর গড়ের অনুরূপ সুউচ্চ ও প্রশস্ত দীর্ঘ পাঁচ মাইল ব্যাপী (দুর্গ) প্রাচীর দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে এর অংশ বিশেষ লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও কিছুকাল আগেও এই প্রাচীরে উচ্চতা ছিল ২০ থেকে ২৫ ফুট, তলদেশ বিস্তৃত ছিল ১০০ ফুটের কাছাকাছি। খাড়ির কাছে এই প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে' এই প্রাচীরকে প্রতাপাদিত্যের মনিদুর্গের প্রাচীব বলা হয়েছে কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক ধারনা করেন, প্রাচীরটি হিন্দুযুগে তৈরী। কালিদাস দত্ত মহাশয় দ্বিতীয় মতটির সমর্থন করতেন। কিন্তু স্থানীয় প্রবাদ, উহা 'জয়রাম হাতীর' গড়। জয়রাম ছিলেন প্রতাপাদিত্যের একজন দুর্গরক্ষক, মনিতট নামে পল্লীও আছে। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি দুর্লভ শিবমূর্তি, ধাতুতে তৈরী, পাদপীটে বৃবেব মূর্তি উৎকীর্ণ ভগবান শিব পদ্মের উপব দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ বাহুভঙ্গ—বামবাহু ত্রিশূলের উপর স্থাপিত, সারা অঙ্গে বহু অলংকাব, উমুও নভস্থলের নিচে লিঙ্গ মূর্তি বিগ্রহটি গুপ্তযুগের উচ্চাঙ্গ ধাতুশিল্পেব পরিচয় দেয়।

৮। **মৈপীঠ ও ছেলবাড়ী**—পল্লী ছুটি, জটার দেউল থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ঠাকুরাণী নদীর কিছু দূরে। মৈপীঠ পল্লীতে কয়েকটি বৃহৎ স্তূপ আছে। এখানে কিছুকাল আগে একটি প্রাচীনকালের প্রস্তর আসন (জল চৌকির মত) ছিল, এখন দেখা যায় না।

দেলবাড়ীতে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি গৃহের বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দেলবাড়ী সংলগ্ন পল্লী মাধবপুর থেকে ব্রোঞ্জের একটি সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি পাওয়া যায়।

খাড়ির কিছু দূরে এক মাইলের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রপুর থেকে একটি কুবেরের মূর্তি এবং নিকটস্থ পল্লী জলঘাটা থেকে গরুড় স্তম্ভের শীর্ষাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে।

৯। **ছত্র ভোগ**—প্রাচীন যুগের একটি তীর্থস্থান ও বন্দর (বোধ হয় খাড়ি মণ্ডলের বন্দর ছিল), এখন তার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। এ স্থানের গঙ্গা নদীর ধারা বহুদিন শুষ্ক হয়ে গেছে। তবে মধ্যযুগে প্রবল ছিল। সে বিষয় জানা যায় ঐ সময় ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী প্রাচীন কাল থেকে বিখ্যাত। এঁর প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। কেহ কেহ বলেন মন্দিরটি সেনযুগে তৈরী ছিল। ছত্র ভোগের নিকটবর্তী **চক্রতীর্থ ও পাতাল গঙ্গা** ঐতিহাসিক গুরুত্ব পূর্ণ দ্রষ্টব্য স্থান।

১০। **বাইশ হাটা বা ঘোষের চক পল্লী**—এখানে একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট, তলদেশের বিস্তৃতি ৪/৫ বিঘা। স্থানীয় প্রচার, এটি 'মঠবাড়ী'। প্রত্নতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেছিলেন এই বাইশ হাটার মঠবাড়ী ও নল গোড়ার মঠবাড়ী পরিচিত স্তূপগুলি, বৌদ্ধ বা জৈন মঠের ধ্বংসাবশেষ, এবং হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন পালযুগের হওয়াই সম্ভব!

১১। **পাথর প্রতিমা**—পুরাবস্তু সমৃদ্ধ পল্লী। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন দেব-দেবীর মূর্তি কিন্তু এ স্থানের বহনযোগ্য প্রাচীন দ্রব্যগুলি অপসারিত হয়েছে।

১২। **রাক্ষস খালি**—সুন্দরবনের দক্ষিণতম অংশের একটি দ্বীপ। সপ্তমুখী বা গঙ্গার একটি শাখা নদী এ দ্বীপটিকে প্রায় ঘিরে রেখেছে। এই দ্বীপে সুন্দরবনের লুপ্ত সভ্যতার বহু নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে দেখা যায় চিত্রখোদিত প্রস্তর খণ্ড, বহু ধ্বংসস্তূপ,

বৌদ্ধ মঠ বা অট্টালিকার পোড়া মাটির তৈজসপত্র। বর্তমানে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই দ্বীপটির বিষয় আলোচনা ও অনুসন্ধান শুরু করেছেন, তার প্রধান কারণ এ স্থানে পাওয়া অনন্যসাধারণ তাম্র-শাসনটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রশালা (মিউজিয়াম) কর্তৃপক্ষ দ্বারা ঐ দ্বীপে অনুসন্ধান কালে এই মহামূল্যবান তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে (মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব-কালে) পূর্ব খাটিকা বা খাড়ি মণ্ডলের সামন্ত নৃপতি শ্রীডোম্মন পাল বঙ্গাধি পতির সহিত বিদ্রোহ করে নিজ শাসন সীমায় (খাটিকামণ্ডলে) স্বাধীন মহারাজা হন। আলোচ্য তাম্রশাসনটি ডোম্মনপাল দেবের একটি ভূদান ব্যাপারে সম্পাদিত হয়েছিল ১১১৮ শকাব্দে (খ্রীঃ ১১৯৬ সালে)।

খাড়ির উত্তর দিকে **দক্ষিণ গোবিন্দপুর**, আটঘরা, **সরিষাদহ, কাঞ্চীরডাঙ্গা, বোড়াল, মলিহাটী শেরবাড়িয়া** প্রভৃতি গঙ্গা নদীর উভয় তীরস্থ পল্লীগুলি প্রাচীনকালে হিন্দুযুগে খাটিকা মণ্ডলের মধ্যে ছিল পরবর্তীকালে বঙ্গোপসাগর কুলের অরণ্য বা সুন্দরবন এ সকল স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

১৩। **দক্ষিণ গোবিন্দপুর** (বারুইপুর থেকে মাইল তিন দূরে উত্তর দিকে) একটি উন্নত গ্রাম। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মহারাজ লক্ষণ সেনের একটি তাম্রশাসন। উহাতে বর্ণিত আছে মহারাজা তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় সংবদে বাৎস গোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় শ্রীব্যাসদেব শর্মাকে 'বিস্তর শাসন'নামে গ্রামখানি দান করেন। ইহা বর্ধমান ভূকতির অন্তর্বর্তী পশ্চিম খাটিকা মণ্ডলের 'বেতজ্ঞ-চতুরক' মধ্যে স্থিত। ৬৯ দ্রোণ ভূমি যার বাৎসরিক ৯০০ পূরাণ উৎপত্তি বিশিষ্ট, সেই ভূমি দান করা হয়েছে এই তাম্রশাসন দ্বারা।

প্রদত্ত ভূমিসীমা বিষয় এই তাম্রশাসনে গঙ্গা নদী ও যে সকল

গ্রামের উল্লেখ আছে, ঐগুলির ২।১টির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। ১৪। বারুইপুর রেল স্টেশনের পুষ্করিণী থেকে সেনযুগের একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। **আটঘরা** বারুইপুরের নিকট নগন্য পল্লী, কিন্তু এস্থান হতে যে সকল মৌর্য আমলের পুরাবস্তু (মূর্তি ও মুদ্রা) আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি প্রমাণ করে সুদূর অতীতে বাংলার সঙ্গে রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে আটঘরা থেকে পাওয়া গেছে, মৌর্য-কুষাণ-সেন যুগের সভ্যতার বহু নির্দশন, কয়েকটি রোমক শিল্পের প্রভাবযুক্ত মুদ্রা, মৌর্য যুগের পোড়ামাটির যক্ষমূর্তি প্রভৃতি। এখান থেকে কয়েকটি রৌদ্রশুষ্ক মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। সেগুলি আদিমযুগীয় মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, এই আটঘরা প্রাচীন যুগের '**অষ্টগৌড়া**'। সরবেড়িয়ার নিকট মলিহাটি গ্রামে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। মন্দিরের দরজায় প্রস্তর নির্মিত বাজুতে হাঙ্গর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। মন্দিরটি পাল বা সেন রাজাদের কালে তৈরী মনে হয়।

১৫। **সরিষাদহ পল্লা** দক্ষিণ বারাসতের নিকট। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, পালযুগের একটি পাঁচ ফুট উচ্চ বিষ্ণুমূর্তি, একটি প্রাচীন স্তম্ভ, দু'ফুট উচ্চ সিংহমূর্তি, একটি ছ'-কোণ বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ প্রভৃতি। সরিষাদহের নিকট কাজীপাড়া মুসলমান প্রধান পল্লী থেকে আবিষ্কৃত প্রস্তর নির্মিত বড় আকারের অতি সুন্দর কারুকার্য বিশিষ্ট বিষ্ণুচক্র ; এই চক্রটির মধ্যে নৃত্যরত বিষ্ণুর মূর্তি বা উদ্ভাত চিত্র দেখা যায়। চক্রটির ব্যাস দেড ফুট, এটি গুপ্ত বা পালযুগের উচ্চাঙ্গের শিল্পের নিদর্শন। সরিষাদহ পল্লীব কিছুদূরে **কাশিপুর**। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের ১৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য। এই মূর্তি এখন আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত। এ পল্লী থেকে গুপ্তযুগের একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সূর্যমূর্তি সুন্দর বনের সীমার মধ্যে অন্যত্র পাওয়া যায়নি। **বোড়াল** গ্রামে অষ্টধাতু নির্মিত ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মূর্তি দর্শনীয় মৌর্য শিল্প।

১৬। **কাকদ্বীপ**—অর্ধ-শহর, এখান থেকে কিছুদূরে আদি গঙ্গা নদীর শাখা কালনাগিনীর কাছে পাকুরতলা পল্লী থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। কুষাণ যুগের পোড়ামাটির মস্তকখণ্ড, গণেশের বিগ্রহ, আর পোড়ামাটির সীল (সেনযুগে প্রচলিত) বাংলা অক্ষর খোদিত, ব্রাহ্মী অক্ষর খোদিত ফলক (এর উপর হাতীর চিত্র আছে) কয়েকটির তলদেশ ঢালু। স্বর্ণকারদের ব্যবহৃত মূর্তির (অনুরূপ বা পয়রা গুড়ের নাগরীর মত) জলপাত্র, এই পাকুরতলার নিকট পুকুরবেড়িয়া পল্লীর মহা দীঘিতে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ কিছু দেখা যায়।

১৭। কাকদ্বীপ গ্রামের পূর্ব-উত্তরে **করঞ্জলী, কাঁটাবেনিয়া, ঘাটেশ্বরা** প্রভৃতি পল্লীতে জৈন যুগের বহু নিদর্শন দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে কাঁটাবেনিয়ার জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথ ঘাটেশ্বর গ্রামের আদিনাথের মূর্তি দুটি ও করঞ্জলী গ্রামের স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য। এটির শিল্পশৈলী দেখে জৈন মন্দিরের বলে মনে হবে।

১৮। **সাগরদ্বীপ** (বা গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থ) রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে এবং মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে এ-দ্বীপ তীর্থক্ষেত্র ও মহর্ষি কপিলের সাধনাসিদ্ধির স্থান বলেই উল্লেখ আছে মাত্র। আর্য সাহিত্যে এ অঞ্চলকে 'রসাতল' 'পাতাল' এবং এ স্থানের অধিবাসী সকলকে 'ম্লেচ্ছ' বলা হয়েছে। তার কারণ সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে এই সাগরদ্বীপ অঞ্চল পূর্ব ভারতের এমনকি সমতটের অন্য স্থান অপেক্ষা নিচু ছিল। সে সময়ে এর অধিবাসীরা ছিল আর্যেতর সগর রাজার অশ্বমেধযজ্ঞ। ইন্দ্রের অশ্ব হরণ, কপিলের অভিশাপে ষাট সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হওয়া প্রভৃতি কাহিনী যুক্ত এই দ্বীপ।

বর্তমানের এই সাগর দ্বীপের মধ্যে **মাহিশবাড়ী, হরিণবাড়ী, মন্দিরতলা**, প্রভৃতি স্থান থেকে বহু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। বিশেষ করে **মন্দিরতলা** পল্লী থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে—স্বর্ণ অলংকার, স্বর্ণ-ইষ্টক বা ইষ্টকাকৃতি স্বর্ণখণ্ড এ-দ্বীপের **সুমতিনগরের** মাটির নিচে দেখা

বহুগৃহের ধ্বংসাবশেষ। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এ দ্বীপে ভ্রমণ কালে বিস্ময়জনকভাবে মাটির তলায় একটি উন্নত জনপদের বা নগরীর ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করেন।

সুন্দরবনের ভূখণ্ডের মাটির নিচে যে কয়েকটি নগরী সমাধিস্থ আছে, তার উল্লেখ মধ্যযুগের পর্তুগীজদের খ্রীঃ ১৫৪০ অব্দের মানচিত্র ও বিবৃতি থেকে জানা যায়। 'যশোর খুলনার ইতিহাস' লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র সুন্দরবনের অনুসন্ধান ভ্রমণে পাঁচটি লুপ্ত নগরীর সন্ধান, কিছু কিছু পান, পর্তুগীজ ডি, বারোস সম্পাদিত মানচিত্রে দেখানো কয়েকটি লুপ্ত নগরীর বিষয় পরে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ জেনেছেন, পর্তুগীজ ডি বারোসের নক্সা বা মানচিত্রটি খ্রীঃ সপ্তদশ শতকে সম্পাদিত এবং লুপ্ত নগরীর নামগুলি পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত। সে কারণ বিকৃত মনে হলেও স্থানগুলির দু-একটির সন্ধান পাওয়া যায় সুন্দরবন সীমার মধ্যে। কোন কোন মনীষী ঐতিহাসিক ধারণা করেন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে কয়েক শতক গঙ্গাবিডিয়া গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ (বর্তমান চব্বিশ পরগণার ভূখণ্ড ঐ দ্বীপের পশ্চিম দক্ষিণতম অংশ বিশেষ) জুড়ে বাস করতো। তাদের রাজধানী ও বন্দর 'গাঙ্গে' ছিল সাগর দ্বীপের গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থল বা তার নিকট কোন স্থানে। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির (খ্রীঃ ১ম-২য় শতকে) সম্পাদিত মানচিত্র এই 'গাঙ্গে' বা গঙ্গানগরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার যে নির্দেশ দেওয়া আছে, তা থেকে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা করা যায়। (গঙ্গাবিডি শব্দটি গ্রীক বিকৃত সম্ভবত শব্দটি গঙ্গারাষ্ট্র, গঙ্গারাঢ়া বা গঙ্গাহৃদি)। কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন : গঙ্গারিডিয়া বাঙ্গালী ছিল।

খ্রীঃ ২য় শতকের অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের রচিত 'পেরিপ্ল্যাস অফ দি ইরিথ্রিয়ানসী' গ্রন্থে গাঙ্গে বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার রাজাদের পূর্বপুরুষ মধ্যভারত থেকে এসে প্রথমে এই গঙ্গাসাগর দ্বীপে বা এ অঞ্চলে বহু কাল বা বংশপরম্পরায় বাস ও রাজত্ব

করতেন। পরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কিরাতদের রাজ্য অধিকার করেন। তখন ঐ রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। এইগুলির উল্লেখ আছে ত্রিপুরা দরবারে রক্ষিত রাজরত্নাকর পুঁথি বা রাজাদের কুলুড়ি গ্রন্থে। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট সমর্থন দেখা যায়।

উক্ত ইতিহাসে একটি মানচিত্রে দেখানো আছে, প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগর কূল পর্যন্ত স্থান ত্রিপুরা বাজ্যের মধ্যে ছিল। মধ্যযুগেও সাগরদ্বীপ উন্নত স্থান ছিল—মহারাজা প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী ও নৌ বন্দর ছিল। পর্তুগীজ পাদ্রিরা সাগব দ্বীপকে 'চাণ্ডিকাল' ও মহারাজা প্রতাপাদিত্য 'কিং অফ চাণ্ডিকাল' বলতেন। (সে সময় বোধ হয় প্রতাপাদিত্যের কুলদেবী চণ্ডীর নাম যুক্ত কোন শব্দে এই দ্বীপ অভিহিত হতো) সাগরদ্বীপ প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী হওয়াও সম্ভব। কারণ জানা যায় যে,যশোর ধুমঘাটা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সকল ভূ-খণ্ডেরই তিনি অধিপতি ছিলেন এবং এ সমগ্র ভূ-খণ্ডে অবস্থিত চব্বিশ পরগণা. খুলনা জেলার স্থানের পরিচয় ছিল যশোর বাজ্যের অংশ বলে। কোন স্থান বা ভূ-ভাগের নাম খুলনা বা ২৪ পবগণা ছিল না। নাথধর্ম বহু প্রাচীন, এ ধর্মে সিদ্ধাচার্য মৎস্যেন্দ্র নাথ (মহারাজ দেবপালের সময়) এই সাগরদ্বীপবাসী ছিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজ মর্দনদের, সাগরদ্বীপ ও বঙ্গোপসাগরকুলের বহু স্থান অধিকার করেন। সুন্দরবন থেকে তাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে. উহাতে শকাব্দ খোদিত আছে ১১৩৯ (খ্রীঃ ১৪১ অব্দ) কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, রাজেন্দ্র বোলে খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাষ্ট্র বা সাগরদ্বীপের গঙ্গারিডিদের রাজধানী ও বন্দর ধ্বংস করেছিলেন।

১৯। **হরিনারায়ণপুর** ঃ—হিন্দু রাজাদেব কালে ব্যাঘ্রতটি মণ্ডলের মধ্যে ছিল, পরে সুন্দরবন সীমার মধ্যে হয়ে যায়। বর্তমানে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা শহর থেকে ৫।৬ মাইল দক্ষিণ পূর্বে হুগলী

নদীর তীরে অবস্থিত বসতি বিরল সাধারণ পল্লী। কিন্তু সম্প্রতি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে মহামূল্যবান। এ পল্লীর পশ্চিমে হুগলী নদীর তীর ভেঙ্গে গেলে পাওয়া যায় একেবারে আদিম যুগ। থেকে মৌর্য শুঙ্গ কুষাণ গুপ্তযুগের বহু নিদর্শন। এখান থেকে পাওয়া আদিম যুগের প্রস্তরের হাতিয়ার কুঠার, মশলা পেষণের চৌকি, হাড়ের তীর-ফলক, রৌদ্রে শুষ্ক মাটির তৈজসপত্রাদি, গুলতি, কবচ, প্রভৃতি। সেগুলি থেকে তিন চার হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন কালের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালের পোড়ামাটির ফলকগুলির উপর খোদিত চিত্রে প্রাচীন কালের গ্রীক-মিশর শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। কয়েকটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্র ফলক বা সীলে খোদিত দেখা যায় দুইটি মানবমূর্তি, যাদের মুখাকৃতি পাখীর মত সুচালো, পরিচ্ছদ ও ভঙ্গী মিশরীয়। এস্থানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা শৃঙ্গাকৃতি শিরোভূষণ প্রাপ্ত তাম্রের ও রৌপ্যের জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

২০। **নামখানা**—একটি ছোট শহর। হেতানিয়া, দোয়ানিয়া নদীর উভয় পার্শ্বে এই শহর অবস্থিত। পৌষ সংক্রান্তির সময় সাগর মেলার তীর্থযাত্রীরা এখান হয়ে লঞ্চ যোগে বা নৌকা যোগে সাগরাভি- মুখে যাত্রা করে। এখানে বর্তমান কপিলবিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সুন্দরবন মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে। বঙ্গভারতী সেবাশ্রম ইহার এক কিঃ মিঃ উত্তরে অবস্থিত। এখানে থানা ও বহু অফিস আছে।

২১। **বকখালি**—বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি সৈকতাবাস। এখানে পূর্বে বক জাতীয় নানা রকমের পাখী বাস করতো। এখানে হরিণও থাকতো। এখানে প্রবর্তক আশ্রমের একটি শাখা আছে। বহু ভ্রমণকারী সর্বদা বাস যোগে এখানে পরিভ্রমণ করতে আসেন।

২২। ভাগবৎপুর—নামখানা থেকে ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত অরণ্যের মধ্যস্থিত কুমীর প্রকল্প এখানে স্থাপিত হয়েছে। অতি আকর্ষণীয় স্থান। এখানে ডিম থেকে কুমীরের বাচ্চা ফুটানো ও

[illegible]
এখানে আছে।

২৮। **গোসাবা** ঃ—ইহা ক্যানিং-এর নিকটবর্তী। ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য বর্তমানে খুবই আকর্ষণীয়। এখানে ইংরেজদের একটি অবণ্যবাসের জন্য বাংলো আছে। ব্যাঘ্রের হিংস্রতা হ্রাস ও ব্যাঘ্র-কুলের বংশবৃদ্ধির মানসে বিশ্ব বন্য-প্রাণী-সংরক্ষক প্রকল্পের আদর্শানুসারে এখানে সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি আছে।

২৯। **সজনেখালি** ঃ—এই স্থানটি পক্ষীবালয় রূপে সুপরিচিত। দেশী-বিদেশী হরেক রকম পাখী এখানে বাস করে। কল-কাকলি-পরিপূর্ণ মনোরম স্থান।

৩০। **ফ্রেজারগঞ্জ** ঃ—ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত হুগলী নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি দ্বীপ। এর পশ্চিমে হুগলী নদী, পূর্বে সপ্তমুখী নদী। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বা বর্তমানের জম্বুদ্বীপ, উত্তরে নামখানা। এর পরিমাপ ১৫ বর্গমাইল। দৈর্ঘে ৯ মাইল এবং প্রস্থে ৩ মাইল। বালিয়াড়ী ও বালিময় সমুদ্র-সৈকত ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৎকালীন বাংলার Lt. Governor, Sir A. Brewde Fraser এই দ্বীপের জঙ্গল সাফাই কাজে হাত দেন এবং এখানে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার চেষ্টা করেন। তাই এই দ্বীপটি ফ্রেজারগঞ্জ নামে সুপরিচিত। এখন সমুদ্রের করাল গ্রাসে সমুদ্রের উদরস্থ। কেবল লম্বা লম্বা কয়েকটি নারিকেল বৃক্ষ ফ্রেজার সাহেবের স্মৃতি বহন করছে। বর্তমানে এই দ্বীপটি নারায়ণীতলা নামে অভিহিত।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ২৪টি পরগণার নাম—

(১) আকবরপুর (২) আমীরপুর (৩) আজিমাবাদ (৪) বালিয়া (৫) বারিডালি (৬) বসনধারী (৭) কলিকাতা (৮) দক্ষিণ সাগর (৯) গড় (১০) হাতিয়াগড় (১১) ইকতারপুর (১২) খাড়িজুরী (১৩) খাসপুর (১৪) ময়দানমল (১৫) মাগুরা (১৬) মানপুর

(১৭) ময়দা (১৮) মুড়াগাছা (১৯) পৈকান, (২০) পেঁচাকুলী (২১) শাতল (২২) শাহানগর (২৩) শাহাপুব (২৪) উত্তর পবগণা।

এই ২৪টি পরগণা নিয়ে গঠিত হয়েছিল ২৪ পরগণা জেলা। বর্তমানে এগুলির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন। ময়দান মল আজকেব সুন্দববনেব অন্তর্গত।

(এই অধ্যায়ের বহু তথ্য 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের 'সুন্দববনেব সভ্যতা' নামক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।)

অষ্টম অধ্যায়

সাগর মেলা—সর্বভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন

এই বিবাট গঙ্গা সাগব মেলাব পিছনে আছে এক অতি প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী। বামায়ণ, মহাভাবত, পুবাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এই পুণ্য কাহিনীব উল্লেখ আছে। এই মেলাব প্রাণ পুরুষ 'সিদ্ধানং কপিলো মুনিঃ।' আর সুদুর্লভা 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে।' কাবণ 'কূর্ম' পুরাণানুসারে—

সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥

(পৃষ্ঠভাগ—৩৬।৩২)

অর্থাৎ গঙ্গা সর্বত্র সুলভা হ'লেও হবিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগব এই তিন স্থানে গঙ্গা অতিশয় দুর্লভা। বর্তমান মেলার মধ্যাস্থিত বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে অবস্থিত মন্দিরাভ্যন্তবে বিদ্যমান শিলাময় সিন্দুব বঞ্জিত দীর্ঘকায় মূর্তিত্রয় পৌবাণিক কাহিনীব জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

প্রথমে দেখা যায় মকরবাহিনী ভগীরথ-ক্রোড়স্থিত চতুর্ভুজা ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গা, মধ্যস্থলে বিরাজিত বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার মহামুনি সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল। আর পার্শ্ববর্তী মহারাজ ইক্ষাকু কুলতিলক সগর। মহামুণি কপিল যোগাসনে উপবিষ্ট। তাঁর বামহস্তে কমণ্ডলু ঊর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণ হস্তে জপমালা, পঞ্চনাগ ছত্র শিরোপরি প্রসারিত, পশ্চিম ভাগে রয়েছে পবন নন্দন রামভক্ত হনুমান, পূর্বভাগে ইন্দ্রহস্তধৃত সুবৃহৎ যজ্ঞাশ্ব এবং ব্যাঘ্রারূঢ়া দেবী বিশালাক্ষী।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় অবগাহন এবং সিদ্ধাচার্য মহর্ষি কপিলের দর্শনের জন্যই সারা ভারতের পুণ্যার্থীর সমাগম হয় সাগর সঙ্গমে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে তাই বর্ণনা আছে—

মহাতীর্থ হইল যে সাগর সঙ্গম।
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে গণন॥
যে গঙ্গাসাগরে নব স্নান দান করে,
সবপাপ মুক্ত হ'য়ে যায় স্বর্গপুরে॥

রামায়ণের এই আদিকাণ্ড থেকে সগর বংশের উপাখ্যান, সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ। কপিলের রোশাগ্নিতে সগরের ষাট সহস্র পুত্রের ধ্বংস, ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন, সগর বংশ উদ্ধার প্রভৃতি কাহিনী জানা যায় এবং এই সকল কাহিনীর মাধ্যমে সুন্দরবন তথা সাগর দ্বীপের প্রাচীনত্বের কথা সহজে অনুমান করা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন উপাখ্যানের মূল কথা নিম্নলিখিত চারিটি পংক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। যথা—

সগরের ছিল ষাট হাজার তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
গঙ্গা যদি স্বর্গ হৈতে আইসেন ক্ষিতি।
তবে সে সগর বংশ পাইবে নিষ্কৃতি॥

কপিলের অভিশাপে সগরের ষাট সহস্র পুত্রের ভস্মীভূত হওয়ার কাহিনী রামায়ণে বর্ণিত আছে। বর্ণনাটি খুবই কৌতুককর, যথা—

একদিন সগর ভাবিয়া মনে মন,
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যাভুবন ॥

* * *

যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর নন্দন।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র ভীত বড় মন ॥

* * *

দিন দুই প্রহরেতে হৈল নিশা প্রায়।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় ॥
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে।
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাঁহার বিদ্যমানে।

ইন্দ্র সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সুফলের ভয়ে ভীত হয়ে অশ্ব অপহরণ করে ধ্যান মগ্ন মহামুনি কপিলের অজ্ঞাতসারে তাঁর পশ্চাতে অশ্বকে বেঁধে রেখে যায়। এর ফল খুবই ভয়াবহ যে হবে সে বিষয়ে অনুমান করা কষ্টকর নয়। কারণ সগরের ষাট সহস্র পুত্র অশ্ব দেখতে না পেয়ে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল তোলপাড় করতে থাকে। তাহাই বর্ণনায় দেখা যায়।—

চারি দণ্ডে খুড়িলেক সে চারি সাগর,
সাগর খুঁড়িয়া গেল পাতাল ভিতর।
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক্— তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল বিদ্যমানে ॥

অশ্ব দেখতে পেয়ে সগর পুত্রগণ মুনিকে চোর সন্দেহ করে প্রহার করতে আরম্ভ করে— এবং তার ফলে মহর্ষির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায়। নিম্ন বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়।—

মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি।
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহেন মহা ঋষি।
ক্রোধেতে নয়নে অগ্নি ঝরে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার—হইল ভস্মরাশি ॥

এই ভস্মীভূত ষাট সহস্র সগর তনয়কে উদ্ধার করেন সগরের বংশধর ভগীরথ। ভগীরথই গঙ্গাকে সাগর দ্বীপে আনয়ন করে সাগরকে মহাতীর্থে পরিণত করেন। সগরের নাম থেকেই সাগর দ্বীপের নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং এই দ্বীপ খুবই সুপ্রাচীন নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই সাগর সম্বন্ধে শুধু মনুষ্যগণ স্নান করে মোক্ষলাভ করে তাই নয়। স্বর্গবাসীরাও এই সঙ্গমে স্নান করে ধন্য হন। তাই বর্ণনা আছে—

স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান।
দেয় ভগীরথের মাথায় দর্বা ধান।

মহাভারতের বন পর্বে এই সগর রাজার কাহিনী এবং ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে লোমশ মুনি এই আখ্যান বর্ণনা করেন। রাজশেখর বসু সম্পাদিত বা অনুবাদিত মহাভারতে নিরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"ইক্ষাকুবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পত্নীদের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গিয়ে পুত্র কামনায় কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁর এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র এবং আর এক পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র হয়। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞের অশ্ব সগরের ষাট হাজার পুত্র কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বিচরণ করতে করতে জলশূন্য সমুদ্রের তীরে এসে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে সগর তাঁর পুত্রদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে সকল দিকে অপহৃত অশ্বের অন্বেষণ কর। সগর পুত্রগণ যজ্ঞাশ্ব কোথাও না পেয়ে সমুদ্র খনন করতে লাগলেন। অসুর, নাগ, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণী নিহত হল। অবশেষে তাঁরা সমুদ্রের উত্তর পূর্ব দেশ বিদীর্ণ ক'রে পাতালে গিয়ে সেই অশ্ব এবং তার নিকট তেজোরাশির ন্যায় দীপ্যমান মহাত্মা কপিলকে দেখতে পেলেন। সগর পুত্রগণ চোর মনে করে কপিলের প্রতি সক্রোধে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির তেজে তখনই ভস্ম হয়ে গেলেন।"—এরপর আরও কাহিনী জানা

যায় যে, সগর রাজার দ্বিতীয়া পত্নী শৈব্যার গর্ভ-জাতপুত্রের নাম অসমঞ্জা। এঁর পুত্রের নাম অংশুমান। এই অংশুমান শোক-সন্তপ্ত সগর রাজার তৃপ্তি বিধানের জন্য পাতালে গিয়ে মহামুনি কপিলকে তুষ্ট করে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করতে সগরকে সাহায্য করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে সগর স্বর্গারোহণ করলে অংশুমান রাজা হন। এঁর পুত্র দিলীপ আর দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথ গঙ্গা ও মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে গঙ্গাকে পাতালে নিয়ে আসেন এবং গঙ্গার পবিত্র জলের স্পর্শে সগরেব ষাট সহস্র ভস্মীভূত সন্তান উদ্ধার লাভ করেন। জলশূন্য সমুদ্র পুনর্বাব জলপূর্ণ হয় এবং গঙ্গা ভগীরথের কন্যারূপে এখানে ভাগীবথী রূপে পরিচিতা হন এবং সমুদ্র সগরের পুত্ররূপে কল্পিত হয়ে সাগর নামে খ্যাত হয়। কালের দানবগণকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে দেবতা-গণের অনুরোধে মহাতেজা মুনি অগস্ত্য এক গণ্ডূষে সমুদ্রকে জলশূন্য করেছিলেন। সেই সময় থেকে সমুদ্র জলশূন্য ছিল। মহাসাধক ভগীরথের তপস্যার ফলে জলশূন্য সমুদ্র পুনরায় জলপূর্ণ হয়ে উঠে। সগরের ষাট সহস্র পুত্রের ন্যায় সুন্দববনেব বিশেষ করে মৃতপ্রায় সাগর দ্বীপের অগণিত অধিবাসী পূণ্য সলিলা গঙ্গার পবিত্র সুমিষ্ট জলে নবজীবন লাভ করে। জলশূন্য দ্বীপমালা পুনবায় সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা হয়ে উঠে বলে মনে করতে পারি। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা কিছু অসঙ্গত হবে না যে এই পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে একটি নিখুঁত ঐতিহাসিক তথ্য লুক্কায়িত আছে। সগব রাজার নাম থেকে সাগর দ্বীপের নামকরণ এবং ভগীরথের নাম থেকে গঙ্গার ভাগীবথী নামধারণ খুবই সংগত বলা যেতে পাবে। আধুনিক গবেষকদের মতে ভগীবথ একজন বিশিষ্ট বাস্তবকাব। তাঁরই প্রতিভার ফলে গঙ্গাকে বহু জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে লবণাক্ত সাগর দ্বীপে তথা সমগ্র সুন্দরবনের দক্ষিণাংশেব উন্নতি সাধন হয়েছিল। সুতরাং ভগীবথ দেবতাব ন্যায় পূজিত হন।

এখন কালানুসারে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী। কারণ রামায়ণ ত্রেতা যুগে বাল্মিকী কর্তৃক রচিত হয়েছিল আর মহাভারত পরবর্তী দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি ত্রেতা যুগে সাগর দ্বীপের অস্তিত্ব ছিল। কপিলের আবির্ভাব হয়েছিল সত্যযুগে, শ্রীমদ্ভাগবত অন্ততঃ তাই বলে ; তবে বেদের পরবর্তী যুগে অর্থাৎ উপনিষদের যুগে কপিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কপিল কর্তৃক সাংখ্য দর্শনের উল্লেখ আছে। তবে কপিল যে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বুদ্ধ ঘোষ বলেছেন গৌতম বুদ্ধের গুরু সাংখ্য মতাবলম্বী ছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য গবেষক টমাস ও গার্বে এবং ভারতীয় সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও সাংখ্যকে বৌদ্ধধর্মের চেয়ে অনেক প্রাচীন বলে স্বীকার করেছেন। এঁদের মতে সাংখ্য প্রণেতা কপিলের নাম থেকে বুদ্ধের জন্মস্থানের নাম কপিলাবস্তু হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কপিলের সাংখ্য দর্শনের নিরীশ্বরবাদের প্রভাব গৌতম বুদ্ধের উপর প্রবলভাবে পড়েছিল। গৌতম আরও এক ধাপ এগিয়ে যান এবং বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করেন। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী হলেও অবৈদিক নয় বা নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। ষড় দর্শনের ন্যায় সাংখ্য আস্তিক, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ন্যায় নাস্তিক নয়। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপধ্যায়র ভাষায়—'এখানে আস্তিক মানে বেদ-বিশ্বাসী, নাস্তিক মানে বেদ-বিরোধী।' ভারতীয় দর্শনে আস্তিক অর্থে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, নাস্তিক অর্থে ঈশ্বর-অবিশ্বাসী বুঝায় না। যাহোক্, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী দর্শন হলেও ইহা অতি প্রাচীন কাল থেকে সর্বপ্রকার শাস্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সাংখ্যমত সর্বত্র গৃহীত। মহাভারতে এবং রামায়ণে ইহা যেরূপ স্বীকৃত শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহা বহু উল্লেখিত। ১১শ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের বিশদ আলোচনা আছে, আর ৯ম স্কন্ধের ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে সগর বংশের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। শুধু রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ গ্রন্থে নয়

কবিকঙ্কন চণ্ডীতে এই সগর বংশের উপাখ্যান ও সাগর দ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

যেখানে সগর বংশ ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশি গঙ্গার জলে বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে
হৈয়া সবে চতুর্ভুজ বেশ॥
মুক্তিপদ এই স্থান এইখানে করি স্নান
চল ভাই সিংহল নগরে।
তর্পণ করিয়া জলে ডিঙ্গা লয়ে সাধু চলে
গাইল মুকুন্দ কবিবরে॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত, চণ্ডী কাব্যের সময় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ—সম্ভবতঃ ১৫৯৪।৯৫ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং এখন ইহা খুবই স্পষ্ট যে সুন্দরবনের অন্তর্গত সাগর দ্বীপ রামায়ণের পূর্ববর্তী উপনিষদ ও দর্শনের যুগে ও মানুষের কাছে পূর্ণ তীর্থরূপে পরিচিত ছিল। বিশেষ করে মহাস্থান কপিলের সাধনা ক্ষেত্র হিসাবে এই দ্বীপ যুগ যুগান্তর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সকল বর্ণনানুসারে সুন্দরবন অতি প্রাচীন একটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। রামায়ণের রচনার কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিত Winternitz এর মতানুযায়ী খৃষ্টপূর্ব ৪০০—২০০ অব্দ। মহাভারতের রচনাকাল গুরুমুখী মহাভারত রচয়িতা স্বামী বেদানন্দের মতানুসারে ৬১—৬৪ কল্যাব্দ। ইনি মনে করেন "যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন লাভের দিন থেকে কল্যাব্দ আরম্ভ। ৩৭ কল্যাব্দে পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গারোহণ করেন, ৬১ কল্যাব্দে মহাভারত সংকলন আরম্ভ হয় এবং ৬৪ কল্যাব্দে তিন বৎসরে সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ এখন (১৯৪৪ খৃঃ) থেকে ৫০২৫ বৎসর পূর্বে (৩০৭০ খৃঃ পূর্বাব্দে) মহাভারত রচনা সুরু হ'য়ে ৩০৬৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সমাপ্ত হয়। "মহাভারতের সারানুবাদ রচয়িতা রাজশেখর বসু উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল সম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদ আছে। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মতে

খৃঃ পূ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি এই যুদ্ধ হয়েছিল। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে যুদ্ধকাল খৃঃ পূঃ ২৪৪৯। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে খৃঃ পূঃ ১৫৩০ বা ১৪৩০। বাল গঙ্গাধর তিলক, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে প্রায় খৃঃ পূঃ ১৪০০। এফ. ই. পাজিহার, অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং এল. ডি. বার্ণেটের মতে খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দী। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, আদি মহাভারত গ্রন্থ খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টের-জন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ যোজিত হয়েছে।" আমরা এখানে রামায়ণ-মহাভারতের কাল বিচারে নিযুক্ত নয়। তাই আমরা এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা না করে শুধু এই কথা বলতে পারি যে সাগর দ্বীপের উল্লেখ যেহেতু রামায়ণ ও মহাভারতে রয়েছে, সেহেতু আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সুন্দরবন কোন না কোন আকারে রামায়ণ মহাভারতের যুগেও একটি জনপদ ছিল। হয়ত কপিলের রোষানলের ন্যায় প্রচণ্ড সূর্যের তাপে এবং লবণাক্ত আবহাওয়ায় জনশূন্য হয়েছিল—সগরের অগণিত পুত্র যে রূপ ভস্মীভূত হয়েছিল। বহু শত বৎসর পরে আবার ভগীরথের ন্যায় কোন এক মহা তপস্বীর সাধনার ফলে মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গাকে পাতালপুরীতে আনয়ন করে পুনরায় সুন্দরবনকে শস্য শ্যামল করে তোলা হয়েছিল। জহ্নু মুনির ন্যায় পথে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেই মহাশক্তিধর বাস্তুকার ভগীরথকে। মহাদেব যে হিমালয় এবং জহ্নু মুনি যে আজকের দিনের অসহিষ্ণু ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজা সগর যে একজন প্রজাহিতৈষী অযোধ্যাবাসী নৃপতি ছিলেন তাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই ঘটনা থেকে একথাও অনুমান করতে পারি যে সাগর দ্বীপসহ সমূহ সুন্দরবন বা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অযোধ্যা রাজার অধীনস্থ ছিল। বর্তমানে অযোধ্যাবাসী পুরোহিতরাই সাগর দ্বীপের কপিল মন্দিরের অধিকারী। এরাই প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টাকা ও অলঙ্কারাদি প্রণামী অযোধ্যা নগরে বহন করে নিয়ে যায়। আদালতে মামলা করেও

এই অযোধ্যাসীদের এখনও সত্ত্বচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। অযোধ্যারাজ মণ্ডলের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ না হলেও বা অযোধ্যার রাজার অধীনস্থ না হলেও পশ্চিমবঙ্গ এখনও অযোধ্যার হনুমান গড়ী মহান্ত মহারাজগণের অধীনস্থ হয়ে আছে। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার! এবিষয়ে পঃ বঃ সরকার অনুসন্ধান করে একটি ফয়সালা সত্বর করবেন বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুন্দরবনের সুব দ্বীপের ন্যায় সাগর দ্বীপও বহুবার সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়েছে এবং মহর্ষি কপিল মন্দির স্থানান্তরিত হয়েছে। Wilson সাহেবের Essays on Religion of Hindu নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় মন্দিরের চত্বরে একটি প্রকাণ্ড বট গাছ ছিল। আর সেই বট বৃক্ষের পাদমূলে ছিল শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমানজীর দুইটি মূর্তি। এই মূর্তি দুইটি নিশ্চয়ই রামভক্ত ও হনুমান ভক্ত অযোধ্যাবাসী মহান্তদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন রামচন্দ্রের মূর্তি না থাকলেও হনুমানজীর মূর্তিটি বিদ্যমান। আর পরবর্তীকালে লোক-সংস্কারের প্রভাবে সুন্দরবনের লৌকিক দেবী বিশালাক্ষী কপিল মুনির মন্দিরে স্থান করে নিয়েছে। বর্তমান মন্দিরটিতে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর সংমিশ্রণে এসেছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পূণ্যসলিলা গঙ্গা যেমন মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হয়েছে ঠিক তেমনি বঙ্গভূমিতে উত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংমিশ্রিত হয়ে জাতীয় ঐক্য সংহতির এক মহান্ সৌধ রচনা করেছে এই সুপ্রাচীন গঙ্গা সাগর তীর্থে। এই ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির দিক থেকে সাগর দ্বীপের গুরুত্ব অসীম।

——— ——

বাংলা গ্রন্থ　　　সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলার ইতিহাস (২য়)—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
২। বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩। বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। বাংলার নদনদী—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
৫। কৃষি কালচার সংস্কৃতি—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
৬। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।
৭। বাংলা দেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
৮। বাংলা ও বাঙালী—শ্রীমোহিত লাল মজুমদার।
৯। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস—শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদার
১০। ভারতের ইতিহাস কথা—ডঃ কিরণ চৌধুরী।
১১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত (১ম—৪র্থ)—　ঐ
১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
১৪। বাংলার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন।
১৫। নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল।
১৬। বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন।
১৭। ২৪ পরগণার মন্দির—অসীম মুখোপাধ্যায়।
১৮। বাঙালী জীবনে বিবাহ—শঙ্কর সেনগুপ্ত।
১৯। বঙ্গ সংস্কৃতি কথা—প্রসিত রায় চৌধুরী।
২০। বাংলার ইতিহাস (৩য়)—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
২১। বাংলার ইতিহাস (১ম)—রামপতি ন্যায়রত্ন।
২২। বঙ্গ দেশের পুরাবৃত্ত—রামকমল সেন।
২৩। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়।
২৪। গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
২৫। ভাষা সংস্কৃতির উৎসধারা—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
২৬। বাঙালীর সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ।

২৭। বাংলা লোক-সাহিত্যচর্চার ইতিহাস—ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী।
২৮। লোক সংস্কৃতি—নানা প্রসঙ্গ—ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী।
২৯। বাংলার লোক-সংস্কৃতি—ওয়াকিল আহমদ।
৩০। ফোকলোর পরিচিতি—ডঃ মযহারুল ইসলাম।
৩১। বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি— ডঃ দুলাল চৌধুরী।
৩২। বাংলা সাহিত্যে মা—জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।
৩৩। মহাভারত (অনুবাদ)—কালী প্রসন্ন সিংহ ও রাজশেখর বসু।
৩৪। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ—(অনুবাদ)—সুবোধ চন্দ্র মজুমদার।
৩৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন।
৩৬। বাংলার লোক সাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৩৭। বাংলা দেশের ছড়া—ডঃ ভবতারন দত্ত।
৩৮। সংস্কৃতি শিক্ষার ইতিহাস—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৩৯। সংস্কৃতি সাহিত্যের ইতিহাস—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক।
৪০। ঋগ্বেদ সংহিতা (হরফ প্রকাশনী)—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪১। বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা—সম্পাদক—ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪২। বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
৪৩। সুন্দরবন বিচিন্তা—ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানা।
৪৪। গঙ্গাসাগর মেলা—তরুণদেব ভট্টাচার্য।
৪৫। পদবীর উৎপত্তি ওক্রমবিকাশেরইতিহাস—খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক।
৪৬। বঙ্গে নৈষধ বা নমঃশূদ্র—অমরেন্দ্রনাথ বালা।
৪৭। নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ—নরেশচন্দ্র দাস।
৪৮। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাহ্মক্ষত্রিয়—মহেন্দ্রনাথ করণ।
৪৯। বাংলার লোকশিক্ষা—ডঃ কল্যান গঙ্গোপাধ্যায়।
৫০। পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা—সনৎকুমার মিত্র।
৫১। বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয়—অতুলচন্দ্র সুর।
৫২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।
৫৩। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়।
৫৪। মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর—জগন্নাথ মাইতি।

ইংরেজী গ্রন্থ :—

1. Tribes and Castes of Bengal—H. H. Risley.
2. The Omkaos of Sundarbone—W. B. G—
3. Folklore and Student of Literature—A. Taylor
4. Folklore : An Operational Defination— F. L. Utley.
5. History of Bengal—C. U. & D.
6. Adv. History of India—Three Doctors.
7. Discouery of India—Jawaharlal Nehru.
8. Oxford History of India—V. Smith.
9. Vedic Age—Dr. R. S. Guha—Max Muller.
10. The Cultural Heritage of India—
11. The Indus civilization—Wheeler.
12. Ancient India—R. C. Majumdar.
13. Political History of Ancient India—H. C. Roy Chowdhury.
14. Prehistoric Ancient and Hindu India—R. D. Banerjee
15. Culture and Anarchy—M. Arnold.
16. District Hand book (24 Pargs)
17. The Calcutta Review—
18. Census Report—
19. Bengal Past & Present—Vol. 2
20. History of Indian Shipping & Maritime Activity—Radhakumud Mukherjee.

21. History of Bengal, Bihar and Orissa—
O. Mally.
22. Bengal Under Dewani Administration—
Nandalal Chatterjee
23. History of Bengal—Stewart.
24. History of Portugese in Bengal—Campos.
25. The Indian Earthquake—C. P. Andrews.
26. Geographical Dictionary of Ancient &
Mediaval India—N. L. Dey.

—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা নং	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১১	পৌণ্ড	পৌণ্ড্র
১৯	১৫	মহিস্মান	মহিষ্মান
২০	১৮	রায়দীঘ	রায়দীঘি
২৩	২৫	রচনা	রসনা
২৫	২	গঙ্গাবাড়ি	গঙ্গারাড়ি
ঐ	২৭	বর্শীদ্বিপে	বর্শীদ্বীপে
২৮	৮	বেনেলের	রেনেলের
২৯	১৫	বিজরিত	বিজড়িত
৩১	১০	নিম্নোদয়	নিম্নোক্ত
৩২	১৮	ডারোডোরামের	ডারোডোরাসের
৩৭	২৩	স্বত্রাকাবে	ছত্রাকারে
৩৯	১৭	প'রিয়ে	পরিচয়
৭০	১৮	কুলার্ঘগণের	কুলাচার্যগণের
৪২	৮	সফর	শঙ্কর
ঐ	১৪	অম্ব	অনুষ্ঠ
৪৪	২০	প্রাকার্থ	প্রাকার্য
৪৬	৫	পরে	গণের
ঐ	২৩	কাস্পী	কুলপী
৪৮	৯	বংশেও	বংশের
৫১	১৭	পাচীন	প্রাচীন
৫২	৩	কৃষি	কৃষ্টি
৫৩	২৪	পদবী	১২টী
ঐ	ঐ	আভীর	আভীব
ঐ	২৬	মলেপ্রাহি	মলেগ্রাহি
৬০	১৩	দৃষ্টি	দৃষ্ট
৬৩	১৯	কৃষি	কৃষ্টি
৬৪	১৯	ঐ	ঐ
ঐ	২৪	ঐ	ঐ
৬৬	৯	talk	folk
৬৮	১৫	বুলি	খুলি
৭০	১৯	falk	folk
৭৪	২	ঐ	ঐ
৭৫	৬	ত্রেত্রিশ	তেত্রিশ
ঐ	১৯	অযমী	অর্যমা

পৃষ্ঠা নং	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ	২০	অহিব্র	অহির্ব্রধ্ন
ঐ	ঐ	ঋত	ঋত
ঐ	২১	সম্বর	ঈশ্বর
ঐ	আদিত্য, রুদ্র ও বসু শব্দের পর—হইবে।		—
৭৭	৭	জাঙ্গমের	জঙ্গমের
ঐ	১২	প্রধান	প্রধানা
৭৮	৯	সন্ধী	সুন্ধী
ঐ	৬	জঙ্গালি	জঙ্গলি
৮৩	১৯	কেতে	ফেতে
ঐ	ঐ	কাক	কাফ
৮৫	১১	আটার	আঠার
৮৬	১৮	সোস	সোম
ঐ	২৪	উপন্যাস	উপাখ্যান
৮৭	১১	মৌরো	মৌলে
৮৮	৬	বিষম	বিষন্ন
৮৯	১৭	তসতাত	ওসতাত
ঐ	১৯	কাট	কাঠ
ঐ	২১	ঐ	ঐ
৯৩	৮	সপ্নাদেশ	স্বপ্নাদেশ
৯৪	৬	sand	wand
ঐ	১৩	গোপেন্দু	গোপেন্দ্র
ঐ	১৯	ষর্ণ দুর্গা	বনদুর্গা
৯৫	৮	ঠকথাবাদী	ঋকথবাহী
৯৬	৮	আলোকিত	আলোচিত
১০৫	৬	বাবা	বায়া
১০৭	১১	অসিত	প্রসিত
১১৩	২৩	আর্যেরও	আর্যেতর
ঐ	ঐ	অষ্ট্রিতে	অষ্ট্রিক
১১৪	৩	কালের	‘কাল্টের’ (cult)
ঐ	৭	কাণ্ডার বাঘিনীচণ্ডী	কান্তার বাসনী চণ্ডী
১২৩	১১	আবশ্বর	আটেশ্বর
ঐ	১২	আঠনাকাল	আটমাকাল
১২৭	২০	রীত্যানুসারে	রীত্যানুসারে
১২৮	৫	কল্পবেডিয়া	কচু বেড়িয়া
ঐ	১২	আর্বচাল্য	আটচালা
ঐ	২২	মন্দির	মন্দিরটী